পাখী

শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—শান্তিনিকেতন

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

১৩৩১

মূল্য ১৲ এক টাকা

পরম-সাহিত্যানুরাগী

বৰ্দ্ধমানাধিপতি

সুকবি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার্ বিজয়চাঁদ মহাতাব্,

K.C.S.I., G.C.I.E., I.O.M.,

বাহাদুরের

শ্রীকরকমলে

নিবেদন

"পাখী" প্রকাশিত হইল। ইহা আমার "পোকামাকড়" এবং "মাছ ব্যাঙ্ সাপ" নামক পুস্তক দুইখানির অনুবৃত্তি। যাহাতে অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ এবং বালকবালিকাগণ পুস্তকের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন তাহার জন্য ভাষা যথাসম্ভব সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহারা পুস্তক-পাঠে আনন্দ লাভ করিলে ধন্য হইব।

সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এবং বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের ছাত্র শ্রীমান্ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-বর্ম্মা এই পুস্তকের কয়েকখানি ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের নিকটে এবং পুস্তক-প্রকাশক মহাশয়দিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শান্তিনিকেতন
বৈশাখ, ১৩৩১

শ্রীজগদানন্দ রায়

সূচীপত্র

পাখী

প্রথম কথা

আগে দুইখানা বইয়ে * তোমাদিগকে জলের ও ডাঙার অনেক ছোটো প্রাণীদের কথা বলিয়াছি। এখন তোমাদিগকে পাখীদের কথা বলিব।

ভোরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেই দেখি, বাগানের গাছের উঁচু ডালটিতে দু'টি কাক কি জানি কেন, কা—কা করিয়া ডাকে। তার পরে যেমন বেলা হয়, তেমনি বাগানে যে কত পাখী আসে তার হিসাবই হয় না। তখন শালিকের কিচির-মিচির, চড়াইয়ের চড়্-চড়্ শব্দ, হাঁড়ি-চাঁচার সেই ভাঙা গলায় ক্যাঁচর-মেচর আওয়াজ, চিলের চি-হি-হি ডাক সবে মিলিয়া আকাশটা যেন ভরিয়া তোলে। কাহারো বিশ্রাম নাই;—এক দল গো-শালিক বাগানের এক পাশে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল, হঠাৎ পুঁই-ই শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। দু'টা কাক বাদাম গাছের ডালে বসিয়া ঠোঁট দিয়া পালক আঁচড়াইতেছিল, কয়েকটা ফিঙে চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দ করিয়া তাহাদিগকে ঠোকর দিতে গেল;

---

* "পোকামাকড়" এবং "মাছ ব্যাঙ সাপ"।

অমনি তাহারা যে কে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহা বুঝা গেল না। এইরকমে ছাতারে, বুল্-বুল্, ঘুঘু, দয়েল, নীলকণ্ঠ এবং আরো কত পাখী যে ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকে, তাহা তোমরা দেখ নাই কি?

তোমরা বোধ হয় মনে কর, পাখীরা বুঝি সমস্ত দিন খাবার লইয়াই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তাহা নয়,—ছোটো পেটগুলিকে ভরাইবার জন্য তাহাদের সমস্ত দিনই ব্যস্ত থাকার দরকার হয় না। আমাদেরি মতো এই-সব জন্তুর সুখ-দুঃখের জ্ঞান আছে; তা'ছাড়া রাগ, হিংসা, দ্বেষ এবং ভয়ও আছে। আবার কাহারো কাহারো দুষ্টামি বুদ্ধিও আছে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? তাই, পাখীরা যে কেবল খাবারের সন্ধানেই দিন কাটায় এ-কথা বলা যায় না। নিজেদের বাসা বাঁধিবার জন্য চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাখীরা কি-রকম ব্যস্ত থাকে, তাহা একবার দেখিয়ো। তখন তাহাদের আর আহার-নিদ্রার সময় থাকে না; খড়কুটা, ডালপালা, নোংরা নেকড়াকানি ঠোঁটে করিয়া তাহারা গাছের আগায় বাসা বাঁধিতেই সময় কাটায়। ঝড়ে বাসা ভাঙিয়া যাইতেছে, বৃষ্টির জলে সকলি ধুইয়া পড়িতেছে, সেদিকে তাহাদের নজর থাকে না; তাহারা কেবল বাসা বাঁধিতেই ব্যস্ত। কাজেই যদি বলা যায়, পাখীরা কেবল খাবারের সন্ধানেই জীবন কাটায়,

তবে খুবই অন্যায় কথা বলা হয়। তাহাদের ঘর-সংসার আছে, কাচ্চা-বাচ্চাদের পালন করা আছে, আবার শত্রুদের হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করাও আছে।

প্রতিদিনই তোমরা এইরকম কত পাখীই দেখিতেছ! কিন্তু কি নিয়মে ইহাদের শরীরের কাজ চলে, ইহারা কি খায়, কোথায় থাকে এবং কি-রকমেই বা ইহাদের দিন কাটে, তাহা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? আমরা যখন তোমাদের মতো ছোটো ছিলাম, তখন পোষা পায়রাগুলি যখন গলা ফুলাইয়া বকম্-বকম্ করিয়া নাচিত, তখন তাহারা সেই নাচের সঙ্গে কি গান গায়, জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইত। যখন দুই দল শালিক মুখোমুখি বসিয়া এক দলকে আর এক দল তাদের কিচির-মিচির ভাষায় গালি দিতে থাকিত, তখন তাহারা কেন এত গালাগালি করে, তার পরে গালাগালি ছাড়িয়া কেনই-বা মারামারি সুরু করিয়া দেয়, তাহা জানিবার জন্য অস্থির হইতাম। তোমরাও বোধ করি পাখীদের চাল-চলন ভাব-ভঙ্গী জানিতে ইচ্ছা কর। তাই তোমাদিগকে সেই-সব কথাই একে একে বলিব।

প্রাণীদের বিভাগ

তোমরা কত রকম ছোট ও বড় জন্তু-জানোয়ার দেখিয়াছ জানি না। বোধ করি কেঁচো, কেন্নো, কৃমি, আরস্থলা, প্রজাপতি, বিছে, ব্যাঙ, মাছ, সাপ, টিকৃটিকি, কুকুর, বিড়াল, হাতী, ঘোড়া, অনেক জন্তু দেখিয়াছ। কিন্তু ইহাদের সকলেরই শরীরে কি হাড় আছে? ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবে, আরস্থলা, কেঁচো, কৃমি, মাছি, বোল্‌তা প্রভৃতি জন্তুর শরীরের ভিতরে হাড় নাই। হাড় আছে কেবল মাছ, ব্যাঙ, সাপ, টিকৃটিকি, পাখী, ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতি জন্তুদের শরীরে।

তাহা হইলে বলিতে হয়, আমরা যে-সব প্রাণী দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে এক দলের শরীরে হাড় আছে এবং এক দলের হাড় নাই। যে-সব প্রাণীর শরীরে হাড় আছে, তাহাদের হাড়গুলির মধ্যে শিরদাঁড়ার হাড়ই প্রধান। শিরদাঁড়া কাহাকে বলে তোমরা জানো না কি? আমাদের মাথার পিছন হইতে আরম্ভ করিয়া উহা পিঠের উপর দিয়া কোমরের নীচে পর্য্যন্ত গিয়াছে। শিরদাঁড়াকে ভালো কথায় মেরুদণ্ড বলে। যাহাদের শরীরে হাড় আছে, তাহাদের সকলেরই এইরকম শিরদাঁড়া অর্থাৎ মেরুদণ্ড থাকে। তাই এ-সব প্রাণীকে মেরুদণ্ডী নাম দেওয়া হইয়া থাকে। মাছ, ব্যাঙ, সাপ, টিকৃটিকি, পাখী, ছাগল, গরু, ভেড়া, মানুষ, সকলেরই শরীরে মেরুদণ্ড আছে বলিয়া তাহারা

মেরুদণ্ডী। কেঁচো, কেন্নো, আরসুলা, প্রজাপতি, বিছে, এই-সব প্রাণীদের শরীরের হাড়ও নাই, মেরুদণ্ডও নাই, তাই ইহাদের নাম অমেরুদণ্ডী।

কাজেই দেখা যাইতেছে, পৃথিবীতে যত জন্তু-জানোয়ার আছে, তাহাদিগকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী এই দুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু মেরুদণ্ডী জন্তুদের মধ্যে সকলেরই কি শরীরের গড়ন এবং জীবনের কাজ একই রকম? পাখী, মাছ ও কুকুর,—এই তিন রকম জানোয়ারই মেরুদণ্ডী। পাখীর গা পালকে ঢাকা থাকে; তাহারা ডিম প্রসব করে এবং ডিম হইতে বাচ্চা হয়। মাছের হাত বা পা কিছুই নাই, তাহারা পাখীদের মতো নিশ্বাস লয় না। কুকুরের আবার চারিখানা করিয়া পা থাকে; তাহাদের বাচ্চা হয় এবং বাচ্চারা মায়ের দুধ খাইয়া বড় হয়। তাহা হইলে দেখ, পাখী, মাছ ও কুকুর মেরুদণ্ডী প্রাণী হইলেও, তাহাদের শরীরে ও চালচলনে কত তফাৎ। এই-সব তফাৎ দেখিয়া মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আবার (১) মাছ (২) উভচর (৩) সরীসৃপ (৪) পাখী এবং (৫) স্তন্যপায়ী এই পাঁচটি ছোটো শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

আমরা এই বইয়ে মাছ, উভচর ও সরীসৃপদের কথা বলিব না, কেবল পাখীদের কথাই তোমরা জানিতে পারিবে।

পাখীর আকৃতি

পাখী তোমরা অনেক দেখিয়াছ। ইহাদের চিনিয়া লওয়া কঠিন নয়। পাখীর শরীরে দুইখানি করিয়া ছোটো বা বড় ডানা দেখা যায় এবং সমস্ত গা পালকে ঢাকা থাকে। অনেক পাখী এই ডানা দু'খানি নাড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের দু'খানি ডানা ছাড়া আবার দু'খানা পা-ও আছে। তাই ইহারা ডানা দিয়া আকাশে এবং পা দিয়া ডাঙায় চলিয়া বেড়াইতে পারে।

পাখী

এখানে পাখীর একটি ছবি দিলাম। দেখ ইহাদের দেহে মাথা, ধড় এবং লেজ তিনটা অংশই আছে। তা'ছাড়া টিক্‌টিকি, গিরগিটি ও ব্যাঙদের যেমন চারিখানি করিয়া পা থাকে, ইহাদেরও সেইরকম দু'খানা পা ও দু'খানা ডানা আছে। টিক্‌টিকি ও গিরগিটিদের সম্মুখের দু'খানা পা যেন পাখীদের শরীরে দু'খানা ডানা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তোমাদের দু'খানা হাত যদি পিছনে লইয়া গিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা যায়, তখন তোমাদের অবস্থা কি-রকম হয় একবার ভাবিয়া দেখ। তখন তোমরা পা দিয়া হাঁটিতে পারিবে, কিন্তু হাত দিয়া কোনো জিনিসই ধরিতে পারিবে না ; সম্মুখে বেশ ভালো খাবার দিলে তোমরা তাহা মুখে তুলিতে পারিবে না। ভয়ানক মুস্কিল হইবে। খুব ক্ষুধা পাইলে ঘাড় নীচু করিয়া থালা হইতে খাবার মুখে পুরিতে হইবে। পাখীদের সম্মুখের পা দু'খানা ডানার আকারে আছে বলিয়া তাহারা কাঠ-বিড়ালের মতো খাবার পায়ে করিয়া মুখে পুরিতে পারে না। খাবার খাইবার সময় হাত-বাঁধা মানুষের মতোই ইহাদিগকে মাথা হেঁট করিয়া ঠোঁট দিয়া খাবার খাইতে হয়।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এইরকমে খাবার খাইতে বুঝি পাখীদের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হয় না—সহজে মাটি হইতে খাবার খুঁটিয়া খাইবার জন্য ইহাদের গলা খুব লম্বা থাকে, তাই মাথা হেঁট্ করিতে ইহাদের কোনো কষ্ট হয় না। গলাতে পালক লাগানো থাকে বলিয়া তোমরা পাখীদের সরুগলা দেখিতে পাও না। যে-সব পাখীর পা লম্বা, তাহাদের গলাও খুব লম্বা হয়। গলা লম্বা না হইলে তাহারা মাটি হইতে খাবার উঠাইয়া খাইতে পারে না।

হাড়গিলা ও সারসদের পা লম্বা, তাই তাহাদের গলাও খুব লম্বা।

পাখীদের শরীরটা কি-রকম তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? ইহা যেন নৌকার মতো লম্বা। বাতাসের ভিতর দিয়া সহজে উড়িবার জন্যই শরীরের গড়ন এইরকম হইয়াছে। নৌকা যেমন দাঁড়ের জোরে জল কাটিয়া সম্মুখে চলে, পাখীরাও সেইরকম ডানার জোরে বাতাস কাটিয়া শূন্যে উড়িয়া বেড়ায়। পাখীদের গড়ন নৌকার মতো না হইয়া যদি কচ্ছপদের মতো গোলাকার বা গরু ও ছাগলের মতো চওড়া হইত, তাহা হইলে উহারা কখনই বাতাস কাটিয়া সহজে উড়িতে পারিত না।

পাখীদের মাথাগুলি শরীরের তুলনায় কত ছোটো একবার ভাবিয়া দেখ। মাথাগুলি গরু বা ঘোড়ার মাথার মতো বড় হইলে উড়িবার সময়ে তাহাদের কি মুস্কিলই হইত! তখন মাথা লইয়াই তাহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হইত।

ঠোঁট পাখীদের বড় কাজের জিনিস। ইহা দিয়াই তাহারা মাটি হইতে খাবার খুঁটিয়া খায় এবং দরকার হইলে ঠোঁটে করিয়াই খাবার বহিয়া আনে। তার পরে কোনো শত্রুর উৎপাত হইলে ঠোঁট দিয়া ঠুকরাইয়া শত্রুদের তাড়াইতে চেষ্টা করে।

তোমরা হয়ত ভাবো,—পাখীদের ঠোঁট হাড়ের মতো শক্ত জিনিস দিয়া প্রস্তুত। কিন্তু তাহা নয়,—গরু, ছাগল বা ভেড়ার শিঙের মতো একরকম নরম জিনিস দিয়াই ঠোঁট প্রস্তুত হয়। কিন্তু পাখীদের ঠোঁটে বা মুখে দাঁত থাকে না। অতি-প্রাচীনকালের পাখীদের ঠোঁটে দাঁত লাগানো থাকিত কিন্তু এখন সে-সব পাখী আর দেখা যায় না। মাটির তলায় কখনো কখনো তাহাদের যে হাড়গোড় পাওয়া যায়, তাহাতে দাঁতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

পাখীদের ইন্দ্রিয়

চোখ, কান, নাক, জিভ্ এবং গায়ের চামড়াকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। চোখ দিয়া প্রাণীরা বাহিরের জিনিসপত্র দেখে, কান দিয়া শুনে, নাক দিয়া গন্ধ পায়, জিভ্ দিয়া খাবারের স্বাদ বুঝিতে পারে এবং গায়ে কিছু ঠেকিলে চামড়া দিয়া তাহা জানিতে পারে। এই-সব ইন্দ্রিয় আছে বলিয়াই প্রাণীরা চলাফেরা করিতে পারে। এমন অনেক প্রাণী আছে যাহাদের চোখ, কান, নাক ও জিভ্ কিছু নাই। তাহাদের কত কষ্ট একবার ভাবিয়া দেখ। তাহারা ইট্ বা পাথরের মতো পড়িয়া থাকে—চোখে দেখা, কানে শুনা, নাক দিয়া গন্ধ শোঁকার আনন্দ তাহারা কখনই উপভোগ করিতে পারে না।

যাহা হউক, পাখীদের ইন্দ্রিয়গুলির কথা তোমাদিগকে এখন বলিব।

তোমাদের বাড়ীতে পোষাপাখী আছে কি না জানি না,—যদি থাকে, তবে তাহার চোখ দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। কেমন সুন্দর গোলাকার চোখ! চোখের মণিও গোলাকার এবং আমাদের চোখের মতো উজ্জ্বল। আমরা দুই শত বা তিন শত হাত তফাতের জিনিস স্পষ্ট দেখিতে পাই না। কিন্তু পাখীদের মধ্যে অনেকেই দুই মাইল

দূরের জিনিসও স্থন্দর দেখিতে পায়। চিল ও শকুনেরা আকাশের কত উঁচুতে উড়িয়া বেড়ায় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। খুব দূরে মাঠের মধ্যে একটা ছোটো মরা ইঁদুর পড়িয়া থাকিলেও তাহারা সেটিকে দেখিতে পায়। লোকে বলে, ভাগাড়ে মরা গরু-বাছুর ফেলিয়া দিলে শকুনের মাথার টনক্ নড়ে, কিন্তু তাহা নয়। শকুনেরা দূর হইতে ভাগাড়ের মরা গরু দেখিতে পাইয়াই সেখানে নামিয়া আসে। তাহা হইলে বলিতে হয়, পাখীদের চোখের তেজ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।

পাখীদের চোখের পাতা তোমরা নজর করিয়া দেখিয়াছ কি? আমাদের চোখের উপরে ও নীচে যেমন দু'খানি করিয়া পাতা আছে, ইহাদের চোখেও ঠিক্ তাহাই আছে। ইহা ছাড়া আবার আর একখানি পাতাও আছে। এই তৃতীয় পাতাখানি চোখের ভিতরকার কোণে লাগানো থাকে। পাখীরা ইচ্ছা করিলেই, তাহা চোখের উপরে টানিয়া চোখ বুজিতে পারে। তোমাদের কাহারো বাড়ীতে যদি টিয়াপাখী থাকে, তবে দেখিয়ো, দিনের বেলায় ঘুমাইবার সময়ে সে তৃতীয় পাতাখানি দিয়া চোখ বুজিয়া ঘুমাইতেছে।

পাখীর চোখের তিনখানি করিয়া পাতা আছে দেখিয়া তোমরা বোধ হয় আশ্চর্য্য হইতেছ। কিন্তু অনেকদিন আগে, হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তখনকার মানুষের চোখেও তিনখানি করিয়া পাতা থাকিত। সম্মুখে আয়না রাখিয়া তোমার চোখ দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো,—দেখিবে, দুই চোখেরই ভিতরকার কোণায় একটু একটু মাংস ছড়াইয়া আছে। ইহাই তৃতীয় পাতার চিহ্ন। কোনো কারণে মানুষের চোখ হইতে তৃতীয় পাতা লোপ পাওয়ার পরে এখন কেবল ঐ চিহ্নটুকুই দেখা যায়।

তোমরা পাখীদের কান দেখিয়াছ কি ? মানুষ, গরু ইত্যাদি জন্তুদের কানের মতো পাখীদের কান বাহিরে থাকে না,—চোখের কাছে পালকে ঢাকা ইহাদের কানের ছিদ্র আছে। তোমাদের পোষা পাখীর চোখের পিছনের পালকগুলি ধীরে ধীরে সরাইলে কানের ছিদ্র দেখিতে পাইবে। পণ্ডিতেরা পাখীর কানের ভিতরকার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে, পাখীদের চোখ যেমন জোরালো, কান সেরকম নয়।

পাখীদের ঠোঁটের গোড়ায় যে দুইটি ছিদ্র থাকে তাহাই উহাদের নাক। তোমরা পোষা পায়রা, টিয়া বা

বা ময়নার ঠোঁট পরীক্ষা করিলেই নাকের ছিদ্র দেখিতে পাইবে। এখানে বাজ পাখীর মাথার হাড়ের একটি ছবি দিলাম। দেখ, ঠোঁটের উপরকার নাকের ছিদ্র হাড়ের ভিতরে গিয়া কত বড় হইয়াছে।

পাখীর মাথার হাড়

পাখীদের ঘ্রাণশক্তি কি-রকম তাহা বলা কঠিন। নাকের ভিতরকার যন্ত্র দেখিয়া মনে হয়, আমরা যেমন ভালোমন্দ গন্ধ বুঝিতে পারি, বোধ করি পাখীরা তাহা পারে না। পায়রা প্রভৃতি কতকগুলি পাখীর নাকের ছিদ্রকে ঘেরিয়া খানিকটা উঁচু চামড়া থাকে। তোমরা হয়ত ইহা দেখিয়াছ। নাকের চারিদিকে এই উঁচু অংশগুলি থাকে কেন, তাহা জানা যায় নাই। নাকের ভিতরে কোনো ময়লা-মাটি না ঢুকিতে পারে, তাহারি জন্য হয়ত ঐ ব্যবস্থা আছে।

রোদে বেড়াইয়া আসিলে আমাদের জিভ্ যেমন শুকাইয়া যায়, পাখীদের জিভ্ সর্ব্বদাই সেইরকম শুক্‌না থাকে। জিভের উপরে যে-সব ফুস্কারির মত উঁচু-উঁচু অংশ থাকে আমরা তাহা দিয়াই খাবারের মিষ্ট, টক্, তিত, কষা প্রভৃতি স্বাদ বুঝিতে পারি। পাখীদের জিভে

সে-রকম উঁচু অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই মনে হয়, খাবারের জিনিসের স্বাদ পাখীরা বুঝিতে পারে না। পেট না পুরিলে ক্ষুধা থামে না বলিয়াই তাহারা কপ্-কপ্ করিয়া খাবার গিলিয়া থাকে।

কিন্তু সব পাখীর জিভ্ একই রকমের নয়। কাঠ্ঠোক্‌রা পাখী তোমরা হয়ত দেখিয়াছ। পিঁপড়ে উই ও অন্যান্য ছোটো পোকামাকড়ই উহাদের প্রধান খাদ্য। ছোটো পোকামাকড় উহারা ঠোঁট দিয়া ধরিতে পারে না। তাই উহাদের মুখে লম্বা এবং সরু জিভ্ আছে। এই জিভের আগায় আবার আঠার মতো একটা জিনিস লাগানো থাকে। কাঠ্ঠোকরারা চট্ করিয়া ঐ জিভ্ বাহির করে এবং ছোটো পোকামাকড়কে জিভের ডগায় আট্‌কাইয়া মুখে পুরিয়া ফেলে।

এখানে কাঠ্ঠোকরার জিভের একটা ছবি দিলাম। দেখ, জিভ্‌টা কত লম্বা। তোমাদের বাড়ীতে যদি পোষা হাঁস এবং টিয়া থাকে তাহাদের জিভ্‌গুলি

কাঠ্ঠোকরার জিভ্

দেখিয়ো। হাঁসের জিভ্ বেশ পুরু এবং তাহার তুইপাশে আবার তুইখণ্ড মাংসের পিণ্ড থাকে। পুকুরের পাঁক ও কাদা

মুখে লইয়া ঐ মাংসখণ্ডগুলি দ্বারা তাহারা যেই মুখের কাদায় চাপ দেয়, অমনি সেগুলি ঠোঁটের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যায়। তখন মুখে থাকে কেবল কাদায়মিশানো খাবার ও ছোটো পোকামাকড়। বৃষ্টির পরে তোমাদের উঠানে যখন হাঁসেরা চপ্-চপ্ করিয়া কাদা মুখে লইতে থাকিবে, তখন তোমরা ইহা লক্ষ্য করিয়ো। জিভের চাপে যাহাতে সহজে মুখের কাদা ও জল বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার জন্যই হাঁসদের ঠোঁটের পাশগুলি কতকটা যেন করাতের মতো কাটা-কাটা থাকে।

টিয়াপাখীর জিভ্ তোমরা সহজেই দেখিতে পাইবে। দাঁড়ে বসিয়া যখন তাহারা ছোলা ভিজা খাইতে আরম্ভ করে তখন তাহাদের শুক্‌না মোটা জিভ্ স্পষ্ট দেখা যায়। দাঁত নাই, তাই পাখীরা খাবার চিবাইয়া খায় না। কিন্তু টিয়ারা তাহাদের ঠোঁট দিয়া খাবার কতকটা চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে।

আমাদের গায়ের চামড়ায় অসংখ্য রোমকূপ আছে এবং সেই-সব রোমকূপ হইতে ঘাম বাহির হয়। আবার রোমের গোড়া হইতে তেলের মত এক-রকম জিনিস বাহির হইয়া শরীরটাকে ভিজে রাখে। পাখীদের গায়ের চামড়ায় ঐরকম ঘাম বা তেল বাহির করিবার কোনো ব্যবস্থা নাই। তাই তাহাদের পালকের তলার চামড়া

দেখিলেই শুক্‌না খট্‌খটে বলিয়া বোধ হয়। আমাদের মুখ যেমন সর্ব্বদাই পাতলা লালায় ভিজা থাকে পাখীদের কিন্তু সেরূপ থাকে না। ইহাদের জিভের তলায় দুই-এক-জায়গা হইতে যে লালা বাহির হয় তাহা আঠার মতো ঘন। তাই পাখীদের মুখ শুক্‌না থাকে।

যে-সব পাখী কেবল মাংস খাইয়াই পেট ভরায়, তাহাদের জিভ্‌গুলি যেন কতকটা লম্বা এবং নরম। চাল, ধান এবং অন্য শস্যভোজী পাখীদের জিভ্ যেন কতকটা তিন-কোণা ধরণের।

শস্যভোজী পাখীর জিভ্ ও কণ্ঠনালী

এখানে শস্যভোজী পাখীর জিভ্ ও কণ্ঠনালীর ছবি দিলাম।

মাথার কালো চুলগুলিকে চক্‌চকে রাখিবার জন্য তোমরা মাথায় তেল মাখো ও চুল আঁচ্‌ড়াও। কিন্তু পাখীরা তোমাদের মতো তেল মাখে না, তবুও তাহাদের পালকগুলি কেমন চক্‌চকে থাকে তোমরা তাহা দেখ নাই কি? দাঁড়কাকগুলোর গায়ের পালক দেখিলে মনে হয় যেন সে কোথা হইতে এক গাদা তেল মাখিয়া চিক্ চিক্ করিতেছে। সত্যই তেল মাখিয়া পাখীরা পালক চক্‌চকে রাখে। কলিকাতার

যাতুঘরের মরা পাখীদের গায়ের পালক ঠিক পরচুলোর মতোই রুক্ষ।

যাহা হউক, তোমরা স্নানের আগে যেমন শিশি হইতে তেল ঢালিয়া মাথায় দাও, পাখীরা তাহা করে না। উহাদের তেলের ভাঁড় থাকে, লেজের উপরে পালকে ঢাকা। গরুর বাঁটে যেমন আপনা হইতেই দুধ জমা হয়, পাখীদের তেলের ভাঁড়ে তেমনি আপনা হইতেই তেল জমা হয়। পাখীরা সেই তেলই ঠোঁটে করিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গের পালকে মাখায়। কাকেরা তোমাদের বাগানের গাছের ডালে বসিয়া লেজের কাছে ঠোঁট ঘসিতেছে, ইহা তোমরা একটু চেষ্টা করিলেই দেখিতে পাইবে। এই-রকমেই পাখীরা ঠোঁটে তেল লাগায় এবং তার পরে সেই ঠোঁট সর্ব্বাঙ্গে ঘসিয়া পালকগুলিকে চক্চকে রাখে।

পাখীর পা ও নখ

এখানে পাখীর হাড়গোড়ের একটি ছবি দিলাম।

পাখীর হাড়গোড়

শরীর হইতে পালক ও মাংস খসাইয়া লইলে পাখীটিকে যে-রকম দেখায় ছবিটিকে ঠিক্ সেই-রকমে আঁকা হইয়াছে।

দেখ, পাখীর পা মোটা-মুটি তিনখানি হাড় জুড়িয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে। উপরের হাড়খানিকে উরু অর্থাৎ উরতের হাড় বলা যাইতে পারে। আমাদের উরতের হাড় ধড়ের বাহিরে লাগানো থাকে, পাখীদের কিন্তু তাহা থাকে না। ইহাদের উরতের হাড় থাকে ধড়ের মধ্যে লুকানো। মাঝের হাড়খানির আকৃতি ঠিক্ জয়-ঢাক্ বাজাইবার কাঠির মতো নয় কি? এই জন্য ইহাকে ইংরাজিতে "ঢাকের কাঠি" (Drum stick) বলা হয়। সকলের নীচের হাড়ে পাখীদের পায়ের পাতা ও আঙুল জোড়া থাকে। কাক, কোকিল,

শালিক, পায়রা প্রভৃতি সাধারণ পাখীর পায়ের এই শেষ হাড়খানিতে প্রায়ই আঁশের মতো এক-রকম জিনিসে ঢাকা থাকে, পালক থাকে না। এবারে যখন তোমাদের বাড়ীর উঠানে কাক আসিয়া বসিবে তখন দেখিতে পাইবে, উহাদের পায়ের নীচের হাড় কালো আঁশের মতো জিনিসে ঢাকা।

চারি-পায়ে-হাঁটা সোজা। যে-সব জন্তু চারি-পায়ে হাঁটে, তাহারা সমস্ত শরীরের ভারটাকে চারি-পায়ের খোঁটার মধ্যে রাখে। তাই তা'রা টলিয়া কাৎ হইয়া পড়ে না। তোমাদের খোকার গায়ে ছেলেবেলায় বেশী জোর থাকে না, তাই সে চার-পেয়েদের মতো হামাগুঁড়ি দিয়া চলিয়া বেড়ায়। চলিবার সময়ে সে সমস্ত শরীরের ভারটাকে রাখে দু'খানা হাত এবং দু'খানা পায়ের মধ্যেকার চারিকোণা জায়গাটুকুতে,—তাই যখন সে গুড়্ গুড়্ করিয়া বেড়ায়, তখন টলিয়া পড়ে না। চারি-পা-ওয়ালা খাট্ ও টেবিল কত শক্ত তাহা তোমরা দেখ নাই কি? কোনো রকমেই সেগুলিকে উল্‌টাইয়া ফেলা যায় না। কিন্তু তিনপায়া টেবিল একটুতেই উল্‌টাইয়া পড়ে। কারণ তিনটা পায়ার মধ্যে যে তিন-কোণা একটু জায়গা থাকে, তাহারি উপরে সমস্ত টেবিলের ভারটা রাখিতে হয়। ইহা না হইলে টেবিল্ উল্‌টাইয়া পড়ে।

তিনপায়ে হাঁটার চেয়ে তুইপায়ে হাঁটা আরো শক্ত। তুইখানা পা যোগ করিলে যে রেখাটা পাওয়া যায়, তাহার উপরে যদি তোমরা শরীরের ভারটি রাখিতে পার, তবেই খাড়া থাকিতে পারিবে,—তাহা না হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের টলিয়া মাটিতে পড়িতে হইবে। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে মানুষ ও পাখী ছাড়া অন্য কেহই সাধারণতঃ তুই পায়ে হাঁটে না। তাই ইহাদিগকে অনেক চেষ্টা করিয়া তুই পায়ে হাঁটা অভ্যাস করিতে হয়। খোকা ও খুকীরা তুই পায়ে হাঁটিতে গিয়া কত-বার ধপাস ধপাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ।

পাখীদের পায়ের পাতায় কতগুলি করিয়া আঙুল থাকে তোমরা গুণিয়া দেখিয়াছ কি? ইহাদের পায়ে সাধারণতঃ চারিটি করিয়া আঙুল দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে তিনটা আঙুল থাকে সম্মুখে এবং একটা থাকে পিছনে। যে-সব পাখী ডালে বা দাঁড়ে বসিতে পারে তাহাদের সকলেরি পায়ে এই রকমের আঙুল সাজানো থাকে। আঙুল পিছনে ও সাম্‌নে থাকে বলিয়াই ইহারা নির্ভাবনায় ডালে বসিতে পারে। তোমাদের পোষা ময়না যখন দাঁড়ে বসিয়া ঝিমাইতে থাকিবে তখন পরীক্ষা করিলে দেখিবে, সে সম্মুখের ও পিছনের আঙুল দিয়া দাঁড়কে আঁকড়াইয়া আছে।

আঙুল দিয়া একখানা বই বা অন্য কোনো জিনিসকে উঠাইতে গেলে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া আঙুল-গুলিকে একত্র করি এবং তার পরে উহা দিয়া বইখানিকে ধরিয়া উঠাই। পাখীরা যখন ডালে বসে তখন এই রকম চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে গাছের ডাল ধরিতে হয় না। তাহাদের আঙুলে কতকগুলি মাংসপেশী দড়ির মতো এমন ভাবে সাজানো আছে যে, ডালে বসিলেই আঙুল-গুলি আপনা হইতেই বাঁকিয়া ডালকে আঁকড়াইয়া ধরে।

অনেকদিন আগে আমাদের একটা পোষা ময়না ছিল। সে রাত্রিতে খাঁচার ভিতরকার দাঁড়ে বসিয়াই ঘুমাইত। ঘুমাইবার সময় সে কখনই দাঁড় হইতে পড়িয়া যাইত না। তখন ভাবিতাম, ঘুমাইবার সময় আমাদের হাত-পা অবশ হইয়া যায় কিন্তু পাখীদের তাহা হয় না কেন? ঘুমাইবার সময় পাখীরা ডাল হইতে কেন পড়িয়া যায় না, এখন বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। মরা পায়রা বা কাক যদি কাছে পাও, তবে তাহার পা গুটাইয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, তখন আপনা হইতেই পায়ের আঙুলগুলি গুটাইয়া আসিতেছে।

অনেক পাখীর আঙুলে বাঁকা বাঁকা নখ লাগানো থাকে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? তোমাদের পোষা পায়রা, ময়না, বা টিয়া পাখীর আঙুলে ইহা দেখিতে পাইবে।

এখানে কতকগুলি পাখীর আঙুল ও নখের ছবি দিলাম। প্রথম ছবিটিতে তালচোঁচ্ পাখীর আঙুল দেখিতে পাইবে। ইহারা মাটিতে হাঁটিতে এবং ডালে

১—তালচোঁচ পাখীর নখ ২—কাঠ্‌ঠোক্‌রার নখ

৩—মুরগীর নখ

৪—কাক ও শালিকের নখ

৫—মাছরাঙার নখ

৬—বাজ পাখীর নখ

৭—হাঁসের নখ

বসিতে পারে না। তাই উহাদের চারিটি আঙুলই একসঙ্গে আছে। দ্বিতীয় ছবিতে কাঠ্‌ঠোক্‌রার আঙুল আঁকা আছে। ইহাদের তুইটা আঙুল সম্মুখে এবং তুইটা আঙুল পিছনে থাকে। নখও খুব লম্বা।

গাছের ছালে এই-সব নখ আট্‌কাইয়া তাহারা পোকা-ধরা গাছে ঠোকর মারে। তৃতীয় ছবিটি মুরগীর পায়ের ছবি। পায়ের ঐ-সব আঙুল দিয়া উহারা মাটির উপরকার পচা পাতা ও আবর্জ্জনা আঁচ্‌ড়াইয়া খাবারের সন্ধান করে। চতুর্থ ছবিখানিতে কাক, শালিক, ফিঙে প্রভৃতি পাখীর আঙুল আঁকা আছে। এই-সব পাখী গাছের ডালে বসে। তাই ডাল আঁকড়াইবার জন্য একটা আঙুল পিছনে আছে। পঞ্চম ছবিখানিতে মাছরাঙার আঙুল আঁকা আছে। যাহাতে ঝপাৎ করিয়া জলে পড়িয়া মাছ ধরিতে পারে, তাহার জন্য আঙুলগুলির গড়ন যেন কতকটা বাঁকা-বাঁকা নয় কি? ষষ্ঠ ছবিখানিতে যে কোন্ পাখীর আঙুল আঁকা আছে, তাহা তোমরা একবার দেখিলেই বুঝিবে। দেখ, নখগুলি লম্বা, বাঁকা এবং ধারালো। চিল্, বাজ্, শিক্‌রা প্রভৃতির পায়ে ঠিক্ এইরকম নখ দেখা যায়। ছোঁ মারিয়া যখন শিকার করে, তখন উহারা ঐ নখ দিয়াই শিকারগুলিকে চাপিয়া ধরে। ইহাদের বঁড়সির মতো বাঁকা নখগুলিকে দেখিলেই যেন ভয় হয়।

কোন্ পাখীর আঙুল সপ্তম ছবিতে আঁকা আছে, তাহা বোধ করি একবার দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। ইহা হাঁসের আঙুলের ছবি। তোমাদের

পোষা হাঁসগুলি গাছের ডালে বসিয়া ভাঙা গলায় "চক্-চক্" করিয়া ডাকিতেছে,—ইহা তোমরা কখনো দেখিয়াছ কি? ছবিতে দেখ, হাঁসের পায়ের সম্মুখে কেবল তিনটা আঙুল আছে। পিছনের আঙুলের একটু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। পিছনে আঙুল না থাকায় হাঁসেরা ডাল আঁকড়াইয়া গাছে বসিতে পারে না। তার উপরে সাঁতার দিবার জন্য সামনের আঙুলগুলা আবার পাৎলা চামড়ায় জোড়া। তাই জোর করিয়া ডালে বসাইতে গেলে হাঁসেরা ধপাস্ করিয়া ডাল হইতে পড়িয়া যায়।

পাখীর হাড়গোড়

একটা পাখীর কঙ্কালের অর্থাৎ হাড়গোড়ের যে ছবি আগে দিয়াছি তাহা দেখ। পাখী মাত্রেরই গলা লম্বা। দেখ, অনেকগুলি হাড় জুড়িয়া পাখীটির গলা তৈয়ারি হইয়াছে। পাখীর গা যত লম্বা হয়, তাহার গলাও তত লম্বা হয়। ইহা কেন হয়, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। সারসের মতো লম্বা ঠ্যাং-ওয়ালা পাখীর যদি খাটো গলা থাকিত, তাহা হইলে সে মাটিতে মুখ নামাইয়া কখনই খাবার খাইতে পারিত না। রাজহাঁসের গলা কত লম্বা তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এত লম্বা গলা আছে বলিয়াই তাহারা সাঁতার দিতে দিতে গভীর জলের তলা হইতে পোকামাকড় ধরিয়া খাইতে পারে। পাখীদের গলায় মেরুদণ্ডের কতগুলি হাড় আছে তাহা ঠিক্ বলিতে পারিব না। দরকার বুঝিয়া সাধারণ পাখীদের গলায় বারোখানা হইতে পনেরোখানা পর্য্যন্ত হাড় থাকে। কোনো পাখীর গলায় কুড়িখানা পর্য্যন্ত হাড়ও দেখা গিয়াছে।

মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর পিঠের মেরুদণ্ডের হাড়গুলি গায়ে-গায়ে লাগানো থাকে, কিন্তু জোড়া থাকে না। তাই এই-সব প্রাণী শরীরকে হেলাইতে-দুলাইতে পারে। কিন্তু পাখীদের পিঠের মেরুদণ্ডের হাড়গুলি গায়ে-গায়ে সম্পূর্ণ জোড়া থাকে। তাই দেখিলেই মনে হয়, পিঠের মেরুদণ্ড বুঝি একখানা হাড় দিয়া প্রস্তুত। যাহা হউক, মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়া-ছাড়া না থাকায় পাখীরা উড়িবার সময়ে জোরে ডানায় ঝাপট্ দিতে পারে। ছবিতে লেজে যে কয়খানি হাড় দেখিতেছ তাহাও পরস্পর জোড়া। হাড়ের উপরকার মাংসে পাখীদের লেজের পালক থাকে। উড়িবার সময়ে জোরে লেজ নাড়াইবার দরকার হয়। তাই লেজের হাড়গুলিও জোড়া থাকে।

হাড়গোড়ের ছবিখানি দেখিলে বুঝিবে, পাখীদের কণ্ঠার হাড়গুলিও পরস্পর জোড়া; তার পরে আবার বুকে নৌকার সাম্‌নের কাঠের মতো একটা সরু হাড় আছে। যাহাতে সহজে উড়া যায় তাহারি জন্য পাখীদের শরীরের হাড়গোড় এইরকম অবস্থায় থাকে। পাখীদের বুক সরু না হইয়া যদি আমাদের বুকের মতো চওড়া হইত, তাহা হইলে উহারা কখনই সহজে বাতাস কাটিয়া উড়িতে পারিত না। উটপাখীদের উড়িবার দরকার হয় না। তাহারা দৌড়াইয়া চলাফেরা করে। তাই তাহাদের বুকের

হাড় পায়রা এবং অন্য পাখীদের বুকের হাড়ের মতো সরু নয়।

এখন পাখীদের ডানার হাড়গুলি দেখ। ডানার হাড় দেখিলে মনে হয় যেন তাহা পাখীদের হাত। পালকে ঢাকা হইয়াই সেগুলি ডানা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বাহুতে যেমন উপরকার হাত, মাঝের হাত এবং হাতের পাতা, এই তিনটি অংশ আছে, ডানায় ঠিক্ সেই-রকমই তিনটি অংশ দেখা যায়। ছবিতে দেখ, ডানার ঐ তিনটি অংশে এক-একখানি হাড় রহিয়াছে। পাখী যখন ডানা গুটাইয়া ডালে বসিয়া থাকে তখন ঐ তিনখানি হাড় যেন ইংরাজি "Z" অক্ষরের আকারে তাহাদের শরীরের দুইপাশে লাগিয়া থাকে।

পাখীদের ডানার হাড়

আমাদের হাতের তলায় যে-সব হাড় আছে সেগুলি পরস্পর জোড়া নয়; তাই আমরা ইচ্ছা করিলেই হাতের তেলোকে বাঁকাইতে-চুরাইতে পারি। কিন্তু পাখীদের ডানার শেষ হাড়খানিতে যত কুচো হাড় আছে, তাহাদের সবগুলিকেই পরস্পর জুড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। পাখীদের ডানার বড় বড় পালকগুলিই এই হাড়ের উপরে

শক্ত করিয়া লাগানো থাকে এবং উড়িবার সময় সেগুলিকে তাহারা ইচ্ছানুযায়ী জোরে নাড়াইতে পারে।

ঠোঁট লম্বা হইলেও পাখীদের মাথাগুলি গোল এবং শরীরের তুলনায় ছোটো। আগেকার ছবিতে দেখ, প্রকাণ্ড পাখীটির মাথা কত ছোটো। বাচ্চা পাখীর মাথা অনেক টুক্‌রা হাড় দিয়া প্রস্তুত। কিন্তু সেই পাখীই যখন বড় হয় তখন তাহার মাথায় কেবল একখানা মাত্র হাড় দেখা যায়। বাচ্চাদের মাথার টুক্‌রা হাড়গুলিই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়া একখানা হইয়া দাঁড়ায়।

সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের হাড় যত মোটা ও পুরু হয়, তাহাদের শরীরে ততই বল আছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু পাখীদের শরীরে প্রায়ই মোটা ও নিরেট হাড় দেখা যায় না। ইহাদের অধিকাংশ হাড়ই খুব পাৎলা ও ফাঁপা এবং হাড়ের মধ্যেকার ছিদ্রে বাতাস-ভরা। শরীরে এই-রকম বাতাস-ভরা পাৎলা হাড় আছে বলিয়াই পাখীরা সহজে উড়িতে পারে।

পাখীর ঠোঁট

পাখীর ঠোঁটের আকৃতি যে কতরকম আছে তাহার হিসাবই হয় না। তোমরা হয়ত ভাবো, পাখীদের মুখে ভগবান্ যে-রকম ইচ্ছা সেই-রকম ঠোঁট লাগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। ঠোঁট দিয়া মাটী হইতে খাবার তুলিবার উপযুক্ত করিয়াই তিনি পাখীদের ঠোঁট গড়িয়া দিয়াছেন। বকেরা জলে ঠোঁট ডুবাইয়া মাছ ধরিয়া খায়, সেইজন্য তাহাদের ঠোঁট লম্বা হইয়াছে। আবার পায়রারা মাটী হইতে ধান, চাল, সরিষা খুঁটিয়া খায় বলিয়া তাহাদের ঠোঁট খাটো। এখন যদি বকের ঠোঁট পায়রার ঠোঁটের মতো এবং পায়রার ঠোঁট বকের ঠোঁটের মতো হইত, তবে কি মুস্কিলই হইত একবার ভাবিয়া দেখ। তখন বকেরা খাটো ঠোঁট দিয়া মাছ ধরিতে পারিত না এবং পায়রার দলও লম্বা ঠোঁট দিয়া ধান খুঁটিয়া মুখে পুরিতে পারিত না। পাখীদের খাবারের জিনিস নানারকম। কেহ ধান, গম, ছোলা খায়, কেহ-বা মাছ খাইয়া পেট ভরায়, আবার কেহ টাট্‌কা বা পচা মাংস ভিন্ন অন্য খাবার পছন্দই করে না। তাহা হইলে দেখ,

নানারকমের খাবার জিনিস মুখে পুরিবার জন্যই পাখীদের ঠোঁটের আকৃতি নানারকম হইয়াছে।

চিল্, শকুন্ ও বাজ্ পাখীরা কি খায় তোমরা বোধ হয় জানো। ইহারা মরা বা জ্যান্ত প্রাণীর মাংস ভিন্ন অন্য

চিল

বাজ পাখীর মুখ

কিছুই খায় না। তাহাদের ঠোঁটগুলি মাংস কাটিবার মতো ধারালো। এখানে চিলের ও বাজ পাখীর মুখের ছবি দিলাম। দেখ, উহাদের উপরকার ঠোঁট কেমন বাঁকা ও ছুঁচ্‌লো। ইহা দিয়াই ঐ-সব মাংসাশী পাখী মাংস কাটিয়া মুখে দেয়।

সমুদ্রের পাখী

এখানে সমুদ্রের পাখীর মুখের একটা ছবি দিলাম। দেখ ইহার ঠোঁট কি-রকম লম্বা এবং বাঁকানো। ইহা দিয়াই তাহারা সমুদ্রের মাছ ধরিয়া খায়। কিন্তু সমুদ্রের পাখীদের ঠোঁট বাজ্ ও চিলের ঠোঁটের মতো শক্ত ও জোরালো নয়।

মাছরাঙা পাখী হয়ত তোমরা দেখিয়াছ। তবুও এখানে তাহার একটা ছবি দেওয়া গেল। ইহার ঠোঁট

মাছরাঙা

বাঁকা ঠোঁটওয়ালা পাখী

ঠিক্ এক জোড়া চিমটার মতো নয় কি? এই ঠোঁট দিয়াই মাছরাঙারা ছোটো মাছ, টিক্টিকি, গিরগিটি ধরিয়া খায়।

যে-সব পাখী ছোটো পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়, তাহাদের ঠোঁট কখনই মাছরাঙাদের ঠোঁটের মতো নয়। এখানে বাঁকা-ঠোঁট-ওয়ালা মধুচোয়া পাখীর ছবি দিলাম। দেখ, ইহার ঠোঁট কেমন সরু ও বাঁকা। এই ঠোঁট দিয়া পাখীরা ছোটো পোকামাকড় ধরে। মধুচোয়া পাখী-মাত্রেরই ঠোঁট এই ধরণের।

বাবুই, তালচোঁচ্ প্রভৃতি পাখীদের পোকা-মাকড়ই আহার। কিন্তু তাহারা মাটী হইতে পোকা ধরিয়া খায় না। সন্ধ্যায় ও সকালে যখন ছোটো ছোটো পোকা আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তখন তাহারা নানা ভঙ্গীতে উড়িয়া

সেইগুলিকেই মুখে পোরে। কাজেই ইহাদের ঠোঁট চওড়া এবং খাটো না হইলে চলে না। এখানে পোকা-খেকো পাখীর ঠোঁটের একটা ছবি দিলাম। এই ঠোঁটগুলিকে মেলিয়া ইহারা উড়ন্ত পোকামাকড়কে মুখের ভিতরে পোরে। ঠোঁট মেলিয়া হাঁ করিলে ইহাদের হাঁ-গুলিও প্রকাণ্ড হয়।

বাবুই জাতীয় পাখীর ঠোঁট

শস্যভোজী পাখীর ঠোঁট

যে পাখীরা মাটী হইতে কেবল শস্য খুঁটিয়াই খায়, তাহাদের ঠোঁটের গড়ন আবার আর একরকম। চড়াই ও মুনিয়া পাখীরা সাধারণতঃ শস্য ভিন্ন আর কিছুই খায় না। এখানে শস্যভোজী পাখীর মুখের একটা ছবি দিলাম। দেখ, ইহার ঠোঁট কত খাটো ও মোটা এবং নাকের কাছে বাঁকানো।

পাখীর পালক

ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুদের গায়ে লোম না থাকিলে তাহাদের কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার বলিয়া মনে হইত। লোম ছাঁটিয়া দিলে ভেড়াগুলির চেহারা কি রকম বিশ্রী হয়, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? তখন তাহাদিগকে ভেড়া বলিয়াই চেনা যায় না। পাখীদের সম্বন্ধেও ঠিক্ সেই কথাই বলা যাইতে পারে। গায়ের পালক ছাড়াইয়া ফেলিলে পাখীকে পাখী বলিয়াই মনে হয় না। তোমরা বোধ হয় ভাবো, পাখীর গায়ে যেমন-তেমন করিয়া পালক সাজানো আছে; কিন্তু তাহা নয়। যেখানে যে-রকম পালক দিলে উড়িবার সুবিধা হয়, ঠিক্ সেই-রকম পালক তাহাদের ডানায়, লেজে ও গায়ে আছে।

আগে ডানার পালকগুলির কথাই তোমাদিগকে বলিব। পরপৃষ্ঠায় পাখীর ডানার একটা বড় ছবি দিলাম। কিন্তু ছবি দিয়া পালক পরীক্ষা করার সুবিধা হইবে না। তোমরা একটা মরা কাক, শালিক বা পায়রা কাছে

পাইলে পালক-সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিতেছি তাহা উহার গায়ের পালকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়ো।

তোমাদের খাতার কাগজ এবং বইয়ের উপরটা যেমন এক সমতলে থাকে,—পাখীর ডানাকে মেলাইয়া ধরিলে কি তাহা সেই রকম এক সমতলে থাকে?—ভালো করিয়া দেখিলে বুঝিবে, পাখীর ডানা এক সমতলে থাকে না। তোমরা স্কুলে যাইবার সময় যে ছাতা খুলিয়া মাথায় দাও, তাহার উপরকার আকৃতির কথাটা মনে করিয়া দেখ। খোলা ছাতার উপরটা গোল এবং নীচেটা খোল নয় কি? পাখীদের ডানা কতকটা যেন সেই রকম কুঁজো। ঠিক্ যেন কচ্ছপের পিঠের মতো। কুঁজো দিক্ থাকে ডানার বাহিরে এবং খোল্‌টা থাকে ভিতরে। তাই যখন উড়িবার সময়ে পাখীরা বাহির দিকে ডানার ঝাপটু মারে তখন তাহাতে বাতাস আটকায় না। কিন্তু যখন তাহারা ডানা টানিয়া কোলের কাছে
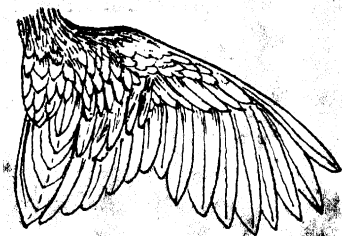
পাখীর ডানা

আনিতে চায় তখন উহার খোলের মধ্যে বাতাস, আট্‌কায়। তাই আট্‌কানো বাতাসকে ঠেলিয়া পাখীরা সম্মুখে অগ্রসর হয়।

তোমাদের আগেই বলিয়াছি—পাখীদের ডানায় তিনখানি করিয়া হাড় আছে। এই হাড়গুলি আমাদের হাতের হাড়েরই সমান। ডানার হাড়ের উপরকার মাংসে পাখীদের বড় বড় পালক গোঁজা থাকে। এইগুলিকে 'কুইল' পালক বলা হয়। তোমরা হাঁসের ও ময়ূরের কলমে হয় ত লিখিয়াছ। এইগুলিকেই আমরা কুইল-পালক বলিতেছি। পাখীদের লেজেও এইরূপ পালক থাকে।
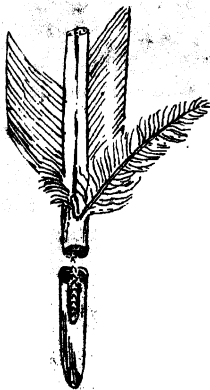
কুইল্‌-পালক

এখানে কোনো পাখীর একটা কুইল-পালকের ছবি দিলাম। দেখ, ইহার মাঝের ডাঁটার নীচে ফাঁপা কিন্তু আগাটা নিরেট্। এই নিরেট্ অংশ হইতে দুই ধারে অনেক শাখা-পালক বাহির হইয়াছে। ঝড়ে কলা-পাতা চিরিয়া গেলে ডাঁটার দুই ধারে চেরাপাতা

কি-রকমে সাজানো থাকে তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কুইল-পালকে ডাঁটার দুই ধারে শাখা-পালকগুলি ঠিক্ সেইভাবেই সাজানো থাকে।

ছবিতে দেখ, কুইল-পালকের দুই ধার হইতে যে-সকল শাখাপালক বাহির হইয়াছে, তাহারা পরস্পর জোড়া আছে। তোমাদের পোষা পায়রার গা হইতে যখন বড় পালক খসিয়া পড়িবে, তখন উহা হাতে করিয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে সত্যই শাখাপালকগুলি ডাঁটা হইতে বাহির হইয়া পরস্পর গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে, মাঝে একটুও ফাঁক্ নাই কিন্তু আঙুল দিয়া একটু টানিলেই এই শাখাপালকগুলি পৃথক্ হইয়া পড়িবে। যে উপায়ে এইগুলি পরস্পর জোড়া লাগিয়া থাকে তাহা বড় মজার। গাছের গুঁড়ি হইতে শাখা অর্থাৎ ডাল বাহির হয়, আবার শাখা হইতে উপশাখা অর্থাৎ ছোট ডাল বাহির হয়। ইহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। পাখীদের কুইল-পালকের ডাঁটায় যে-সব শাখাপালক লাগানো আছে, সেগুলির দুইধার হইতে আর একরকম খুব ছোটো এবং বাঁকানো পালক উপশাখার মতো বাহির হয়। এই অতি সূক্ষ্ম পালকগুলিই কাছাকাছি পালককে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ডাঁটার দুইধারের শাখাপালকগুলি জুড়িয়া রাখে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, একটা পাখীর

পালক পাইলেই তোমরা তাহার সেই আগা-বাঁকানো উপশাখা দেখিবে। কিন্তু খালি চোখে খুব চেষ্টা করিলেও সেগুলিকে দেখিতে পাইবে না। উপশাখা-পালকগুলি এত ছোটো যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা ভালো আতসী কাচ ছাড়া ভালো দেখা যায় না।

তোমরা কোনো পাখীর কুইল্‌-পালক হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, ইহার ডাঁটার দুই ধারে ছুরির ফলার মতো যে পালক আছে, তাহা সমান চওড়া নয়। আগের ছবিতে দেখ ডাইনের ফলক বাঁ-দিকের ফলকের চেয়ে কম চওড়া। কেন এরকম থাকে তোমরা বোধ হয় জানো না। ডানায় প্রত্যেক কুইল্‌-পালক এমনভাবে সাজানো থাকে যে, উহার চওড়া-দিক্‌টা কাছের অন্য এক পালকের কম-চওড়া দিক্‌টাকে চাপিয়া রাখে। তোমরা যে-কোনো মরা বা জ্যান্ত পাখীর ডানা খুলিলে ইহা দেখিতে পাইবে। তাই ডানার যে-কোনো পালক হাতে পড়িলে, তাহার চৌড়া ফলক ডাইনে আছে কি বামে আছে, তাহা দেখিয়া পালকটি ডাইনের কি বামের ডানায় ছিল হিসাব করিয়া বলা যায়। কোনো কুইল্‌-পালকের গোড়া ধরিয়া তোমরা যদি তাহার সদর দিক্‌টা পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, বাঁয়ের ডানার চওড়া ফলকগুলি থাকে বাঁয়ে এবং ডাইনের

ডানার সেই ফলকগুলি থাকে ডাইনে। ইহা বুঝিয়া যে কোনো কুইল্‌-পালক হাতে পড়িলে, তাহা পাখীর কোন্ ডানায় লাগানো ছিল, তাহা চট্ করিয়া বলা যায়।

কুইল্‌-পালকের যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে তাহা তোমরা একবার ভালো করিয়া নজর কর। দেখ, উহা উল্‌টা করিয়া আঁকা আছে। সোজা করিয়া আঁকিলে পালকের চওড়া ফলকটি থাকিত ডাইনে। সুতরাং বলিতে হয়, যে-পালক দেখিয়া ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহা কোনো পাখীর ডাইনের ডানাতে লাগানো ছিল।
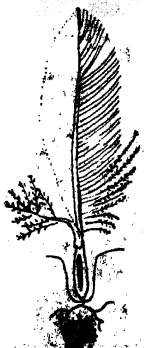
কুইল্‌-পালক ছাড়া পাখীদের শরীরে আরও তিন রকম পালক আছে। ইহাদের গলা, পিঠ, উরত যে-পালকে ঢাকা থাকে তাহার একটা ছবি এখানে দিলাম। ইহার গড়ন ঠিক্ কুইল্‌-পালকেরই মতো। তবে আকৃতি ছোটো। যাহাতে গায়ে হঠাৎ আঘাত না লাগে এবং বৃষ্টির সময় গায়ে জল প্রবেশ না করে তাহার জন্য পাখীদের শরীর এই পালকে ঢাকা থাকে। এইগুলিকে আচ্ছাদন-পালক বলা যাইতে পারে।

আচ্ছাদন-পালক

এই ত গেল দুইরকম পালকের কথা। তৃতীয় পালকগুলি থাকে পাখীদের গায়ের ভিতরে আচ্ছাদন-পালকের নীচে। পাখীদের গায়ে যত পালক আছে তাহার মধ্যে এইগুলিই সবচেয়ে নরম। সেই জন্য তাহাদের কোমল-পালক বলা যাইতে পারে। তোমাদের বাড়ীতে যদি পোষা পায়রা থাকে, তবে পায়রাদের খোঁপের কাছে আচ্ছাদন ও কোমল-পালক দুই-একটি পড়িয়া থাকিতে দেখিবে। ঠোঁট্ দিয়া পালকে তেল লাগাইবার সময়ে পাখীদের গা হইতে এই সকল ছোটো পালক প্রায়ই খসিয়া পড়ে। তোমরা ইহা খোঁজ করিয়া পরীক্ষা করিয়ো। অন্য পালকে শাখা-পালকগুলি পরস্পর জোড়া থাকে কিন্তু কোমল-পালকে তাহা থাকে না। পাখীদের বাচ্চার গা তোমরা দেখিয়াছ কি?—ইহাদের গায়ে প্রথমে কোমল পালকই দেখা যায়। দেখিয়ো, এক-একটা নলের মধ্য হইতে এই পালকগুলি কেমন গজাইয়া উঠিতেছে। পাখীরা বড় হইলে এই সব পালক ঝরিয়া যায় ও সেখানে অন্য পালক বাহির হয়। তোমাদের দুধে-দাঁত পড়িয়া গেলে যেমন শক্ত বড় দাঁত বাহির হয়, এ যেন সেই রকমের ব্যাপার। ঠাণ্ডার দিনে যাহাতে শরীর হইতে তাপ বাহির হইয়া না যায় এবং গরমের দিনে যাহাতে বাহির হইতে শরীরে বেশি

তাপ আসিতে না পারে তাহারি জন্য এই ছোটো কোমল-পালকগুলি পাখীদের গায়ে থাকে। এই তিন রকম পালক ছাড়া পাখীদের গায়ে আরো এক-রকম পালক দেখা যায়। এগুলিকে দেখিতে চুলের মতো, তাই ইহার নাম কেশ-পালক। এগুলিকে তোমরা সহজে দেখিতে পাইবে না। পাখীর গায়ের অন্য পালক ছিঁড়িয়া ফেলিলে ছালের কাছে এই পালক চুলের মতো দেখা যায়।

তোমরা বোধ হয় মনে কর, আমাদের মাথার সকল জায়গা হইতেই যেমন চুল বাহির হইয়াছে, পাখীদের গায়ের চামড়ার সব জায়গাতেই বুঝি সেই-রকমে পালক সাজানো আছে। কিন্তু তাহা নয়। পাখীদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে পালক বাহির হয় না। টাক্-ওয়ালা মাথার জায়গায় জায়গায় যেমন একেবারে চুল থাকে না, পাখীদের গায়ের নানা জায়গায় সেই-রকম একেবারে পালক দেখা যায় না। আমরা বাহির হইতে ইহা বুঝিতে পারি না। কারণ আশ্-পাশের লম্বা পালকগুলি সেই টাক্-ওয়ালা জায়গা ঢাকিয়া রাখে। তোমরা কোনো পাখীর গায়ের আচ্ছাদন-পালক ধীরে ধীরে আঙুল দিয়া সরাইলে, পালকহীন জায়গাগুলি দেখিতে পাইবে। পাখীর যে-সব বাচ্চা দু'পাঁচদিন ডিম হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের

গা দেখিলে কোথায় কোথায় পালক একবারে থাকে না, তাহা তোমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

এখানে বাচ্চা পাখীর একটা ছবি দিলাম। ইহার গায়ে কেবল কালো কালো পালকের অঙ্কুরমাত্র আছে। দেখ, ইহার পিঠের ও লেজের দিক্‌টার অনেক জায়গাতেই পালক নাই।
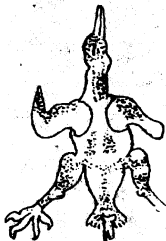
পালক বাহির হইবার স্থান

পাখীদের গায়ে পালকগুলি কেমন সুন্দর-ভাবে সাজানো থাকে তোমরা নিশ্চয়ই তাহা লক্ষ্য করিয়াছ। খড় দিয়া ঘর ছাইবার সময়ে বা ছাদে টালি সাজাইবার সময়ে আমরা খড় ও টালিগুলিকে একের উপরে আর একটিকে সাজাই, ইহাতে ছাদে একটুও ছিদ্র থাকে না। তোমরা যদি পাখীর গায়ের পালকগুলিকে পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, আমাদের ছাদের টালি ও খড়ের মতো পালকগুলি পরস্পর উপরে-উপরে থাকিয়া পাখীদের গায়ে একটুও ছিদ্র রাখে নাই। তাই বৃষ্টির সময়ে ইহাদের গায়ে জল পড়িলে তাহা চট্ করিয়া গা হইতে ঝরিয়া পড়ে। সুন্দর ব্যবস্থা নয় কি? মানুষেরা বোধ করি পাখীদের গায়ের পালক সাজানো ছাদে টালি ও খড় সাজাইতে শিখিয়াছে।

পাখীদের পালক-ঝরা

আমাদের গায়ের চামড়ায় পালক লাগানো নাই এবং চুলও বেশি নাই। ছালই আমাদের শরীরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু একই ছাল চিরকালই আমাদের শরীরকে ঢাকিয়া রাখে না। মাঝে মাঝে আমাদের গায়ে নূতন ছাল হয়, তখন পুরানো ছাল স্নানের সময়ে গা রগ্‌ড়ানোর সঙ্গে খসিয়া পড়ে। তোমরা ইহা দেখিতে পাও না বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই আমাদের গায়ের কোনো-না-কোনো অংশ হইতে এই-রকমে ছাল খসে। খুব অসুখের পরে আমাদের গা হইতে মরা চামড়া উঠিয়া যায়; ইহা তোমরা দেখ নাই কি?—আমাদের গা হইতে যে ছাল খসে, তাহা ঐ মড়া চামড়ারই মতো।

সাপ, গিরগিটি, টিক্‌টিকিরাও গায়ের ছাল ও আঁশ মাঝে মাঝে বদ্‌লায়। সাপের খোলস জিনিসটা সাপদের গায়েরই মরা চামড়া। পাখীদের গায়ের পালক এবং মাছ টিক্‌টিকি ও সাপদের গায়ের আঁশ একই রকমের জিনিস।

তাই পাখীরা গায়ের পালক বদ্‌লায়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি ? গাছের পাতা যেমন বৎসরে একবার বা দুইবার করিয়া আপনিই ঝরিয়া পড়ে, পাখীদের গায়ের সব পালকই বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া খসিয়া যায় এবং খসা পালকের গোড়া হইতে নূতন পালক গজায়। যাহাদের গা হইতে বৎসরে দুইবার করিয়া পালক ঝরে, এরকম পাখীও কিন্তু অনেক আছে।

তোমাদের বাড়ীতে যদি পোষা পাখী থাকে তবে দেখিবে, বৎসরের কোনো-কোনো সময়ে খাঁচার তলায় অনেক ঝরা পালক পড়িয়া রহিয়াছে। এই-রকম পালক-খসা বর্ষার শেষেই বেশি দেখা যায়। তোমরা বোধ হয় ভাব, গা খুঁটিতে খুঁটিতে পালকগুলি খসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। পালক আপনিই খসে। কিন্তু আমড়া ও বেলগাছের পাতাগুলি যেমন এক-সময়ে সব ঝরিয়া পড়ে সে-রকমে পাখীর পালক ঝরে না ; অল্প কয়েকদিনের মধ্যে একে-একে সব পালকই খসিয়া যায়।

পাখীদের ডানার পালক-খসা একটা মজার ব্যাপার। একদিকের ডানার কুইল্‌-পালক যেই খসিয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য ডানার পালকটিও খসিয়া পড়ে। কেন এই-রকমে ডানার পালক খসে, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। মনে কর, কোনো পাখীর একদিকের ডানার

পাঁচটা পালক খসিয়া পড়িল। এই অবস্থায় একদিকে পাত্‌লা ডানা এবং আর একদিকে পালকে-ভরা পুরু ডানা দিয়া পাখীরা কি উড়িতে পারিবে? কখনই পারিবে না। তালে তালে সমানভাবে দাঁড় না বাহিলে যেমন নৌকাকে এগানো যায় না, সেই-রকম দুই ডানায় সমান জোরে বাতাস কাটিতে না পারিলে পাখীরা উড়িতে পারে না। তাই উড়িবার সুবিধার জন্যই পাখীদের দুই ডানা হইতে সমান সমান সংখ্যায় পালক খসিয়া পড়ে। তোমাদের পোষা পাখী থাকিলে ইহা লক্ষ্য করিয়ো। খাঁচায় আট্‌কানো পাখীরা উড়ে না। কিন্তু তথাপি তাহাদের ডানার পালক জোড়া-জোড়া খসিয়া পড়ে।

হাঁসদের ডানার পালক প্রায়ই এই নিয়মে ঝরে না—ইহাদের কুইল্‌-পালক একই সময়ে সব ঝরিয়া পড়িতে দেখা যায়। এই সময়ে তাহারা একটুও উড়িতে পারে না।

পাখীদের উড়িবার প্রণালী

যে জিনিসকে বাতাসে ছাড়িয়া উড়াইতে হয়, তাহার মালমসলা সবই খুব হাল্কা হওয়া দরকার। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ঘুড়ি উড়াইয়াছ। খুব পাত্‌লা কাগজে ও পাত্‌লা বাঁশের চ্যাটা দিয়া ঘুড়ি তৈয়ারি করিতে হয়; তাই ঘুড়ি বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। কাগজ ও বাঁশের চ্যাটায় ঘুড়ি তৈয়ার না করিয়া তোমরা যদি টিনের পাত ও লোহার শিক্ দিয়া ঘুড়ি তৈয়ারি করিতে, তবে ঘুড়ি মজবুত হইত বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ভারি হইত বলিয়া কখনই উড়িত না।

তাহা হইলে দেখ, কোনো জিনিসকে বাতাসে উড়াইতে গেলে, তাহাকে খুব হাল্কা এবং খুব মজবুত করা দরকার। ব্যোমযান্ খুব মজবুত এবং খুব হাল্কা; তাই তাহা আকাশে উড়ে। আজকাল যে-সব এরোপ্লেন্ আকাশ দিয়া চলাফেরা করিতেছে, সেগুলি খুব হাল্কা এবং মজবুত। আবার তাহাতে যে কল আছে তাহারও জোর খুব বেশি।

তোমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে—যাহাতে সহজে উড়িতে পারে তাহারি জন্য ভগবান্ পাখীদের দেহ হাল্কা ও মজবুত করিয়া গড়িয়াছেন। জন্তু-জানোয়ারের দেহে যত জিনিস আছে, তাহার মধ্যে হাড়ই বেশি ভারি। পাখীদের শরীরের হাড় যে কত পাতলা ও ফাঁপা তোমাদিগকে তাহা আগেই বলিয়াছি। কেবল তাহাই নয়, ব্যোমযান, জেপেলিন্ প্রভৃতি উড়ো-জাহাজে যেমন গ্যাস্ পোরা থাকে, তেমনি পাখীদের হাড়ের ভিতরে এবং শরীরের ভিতরকার অনেক জায়গার থলিতে বাতাস ভরা থাকে। পাখীদের মাথার হাড় যদি তোমরা পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে তাহা যেন কাগজের মতো পাত্‌লা। এই রকমে পাখীদের শরীর খুব হাল্কা অথচ মজবুত্ হইয়াছে বলিয়াই তাহারা বাতাসে উড়িতে পারে। কেবল হাড়ের ভিতরকার বাতাস এবং শরীরের ভিতরকার থলির বাতাসই যে পাখীদের শরীর হাল্কা করে তাহা নহে, সর্ব্বাঙ্গের আচ্ছাদন-পালকগুলি ফাঁকে ফাঁকে যে বাতাস শরীরের চারিদিকে আট্‌কাইয়া রাখে তাহাও পাখীদের শরীর হাল্কা করে।

পাখীরা যে ঠিক্ কি-রকমে এই হাল্কা শরীরগুলি যেখানে ইচ্ছা চালাইয়া লইয়া বেড়ায়, তাহার সব কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিব না। বিষয়টি এমন জটিল

যে, সব ব্যাপার আজো জানাও যায় নাই। তাই পাখীদের উড়ার মোটামুটি কথাগুলিই তোমাদিগকে বলিব।

কোনো জিনিসকে আকাশে উড়াইতে গেলে সেটি যাহাতে ধপাস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া না যায় এবং সাম্‌নে চলিতে পারে প্রথমেই তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। পাখীরা যখন উড়িবে তখন লক্ষ্য করিয়ো; দেখিবে, ডানাগুলি দ্বারা ঝাপট্ দিয়া পাখীরা শরীরগুলিকে ভাসাইয়া রাখে। তার পরে আমরা যেমন সাঁতার দিবার সময়ে হাত দু'টাকে একবার পিছনে এবং একবার সাম্‌নে চালাইয়া শরীরকে সাম্‌নের দিকে চালাই, পাখীরা ডানা দুইটিকে ঠিক্ সেই রকমেই পিছনে এবং সাম্‌নে নাড়িয়া সম্মুখে আগাইতে থাকে।

নৌকা চালাইতে গেলে দাঁড় ও হাল দুয়েরই দরকার হয়। হাল থাকে নৌকার পিছনে এবং দাঁড় থাকে নৌকার দুইপাশে জোড়া জোড়া। দাঁড় ও হাল নৌকা চালাইবার কোন্ কাজে লাগে, তাহা বোধ হয় তোমরা সকলে জানো না। মাঝিরা যখন জোড়া জোড়া দাঁড়ে জল আট্‌কাইয়া খিঁচে মারে, তখন নৌকা সম্মুখে এগাইয়া যায়। কিন্তু যখন নৌকাকে আশে-পাশে ঘুরাইবার দরকার হয়, তখন হালের খোঁচড় দিতে হয়। তাহা হইলে বলিতে হয়, দাঁড়ে নৌকাকে এগাইয়া দেয়,

হালে তাহার চলিবার দিক্ ঠিক্ করে। পাখীদের ডানা দু'খানিই যে দাঁড়ের কাজ করে, তাহা আগেকার কথা হইতে বোধ করি তোমরা বুঝিয়াছ। কিন্তু কেবল দাঁড়ে যেমন নৌকা চলে না, তেম্‌নি কেবল ডানা নাড়িয়া পাখীদের ইচ্ছামত এদিক্-সেদিক্ যাওয়া চলে না। কাজেই ইহাদের শরীরে হালের মতো একটা-কিছু থাকার দরকার হয়। পাখীদের পিছনের লেজই হালের কাজ করে। তোমরা যদি কোনো পাখীর উড়িয়া বেড়ানো লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে উপরে উঠিবার সময় সে লেজটাকে উঁচু করে এবং নীচে নামিবার সময় সেটিকে নীচু করে।

চিল্ ও শকুন্‌গুলো ডানা স্থির রাখিয়া খুব উঁচুতে কেমন উড়িয়া বেড়ায় তাহা তোমরা সকলেই হয় ত দেখিয়াছ। কিন্তু লেজ ও ডানা না নাড়াইয়া তাহারা কি-উপায়ে এই-রকম উড়িয়া বেড়ায় তাহা আজো ভালো বুঝা যায় নাই। নীচের বাতাস যখন স্তব্ধ, তখন আকাশের অনেক উঁচুতে প্রায়ই ঝড়ের মতো বাতাস বহে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, মাঝি-মাল্লারা যেমন জাহাজের মাস্তুলে ছোটোবড় পাল নানারকমে খাটাইয়া বাতাসকে বশে আনে, এবং পরে সেই বাতাসে জাহাজ চালায়, চিল্-শকুনেরাও হয়ত সেই-রকমে বাতাসকে বশে

আনিয়া উড়িয়া বেড়ায়। এই-সব পাখীদের ডানায় খুব লম্বা-চওড়া কুইল্-পালক আছে। কাজেই সেগুলিকে দরকার অনুসারে জাহাজের পাইলের মতো হেলাইয়া-দুলাইয়া বাতাসকে বশে আনা অসম্ভব নয়।

মাছরাঙা, গ্যাংচিল্, শিকরা প্রভৃতি পাখীরা কি-রকমে মাছ ও অন্য জন্তু শিকার করে তোমরা দেখিয়াছ কি? শিকারের সময়ে ইহারা এক জায়গায় থম্‌কাইয়া উড়িতে থাকে, তার পরে ঝপাৎ করিয়া শিকারের উপরে পড়িয়া সেগুলিকে নখ দিয়া চাপিয়া ধরে। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, থম্‌কাইয়া উড়িবার সময়ে এইসব পাখী খুব ঘন ঘন ডানা নাড়ে।

ফিঙে, টিট্টিভ, হাঁড়িচাঁচা প্রভৃতি পাখীদের উড়িবার রকম তোমরা হয়তু দেখিয়াছ। যদি না দেখিয়া থাক, তবে আজই তোমাদের বাগানে গিয়া এই-সব পাখীর উড়িবার রীতি দেখিয়ো। কাক, শালিক প্রভৃতি পাখী যেমন ঠিক্ সিধে পথে এক গাছ হইতে আর এক গাছে উড়িয়া যায় ঐসব পাখী কখনই তাহা করে না। ইহাদের চলার ভঙ্গী ঠিক্ যেন ঢেউয়ের মতো উঁচু-নীচু। লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, উড়িবার সময়ে ইহারা এক-একবার ডানাগুলিকে সম্পূর্ণ গুটাইয়া নীচে নামিতেছে আবার পরক্ষণেই ডানা খুলিয়া উপরে

উঠিতেছে। এই রকমে ডানা গুটানো ও খোলাতেই ঐ-সব পাখীর ঢেউয়ের মতো গতি হয়।

মানুষদের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ানক অলস, নাওয়া-খাওয়ার সময় ভিন্ন তাহারা যেন নড়িতেই চায় না। আবার আর এক-রকমের মানুষ আছে, যাহারা প্রাণান্তে চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ভয়ানক অসুখ, ডাক্তার বলিতেছেন বিছানা হইতে উঠিয়ো না, তবুও তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাজকর্ম্ম করে। যতদিন গায়ে জোর থাকে, ততদিন এইসব লোক চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। মানুষেরা এইরকম অলস এবং চট্‌পটে হয় অভ্যাসের ফলে। তোমরা যদি ছেলেবেলা হইতে চট্‌পটে হইতে ইচ্ছা কর, তবে বিনা কাজে কখনই চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। পাখীদের মধ্যেও অলস ও চট্‌পটে এই দুই রকমেই পাখী দেখা যায়। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা তাহাদের এই সব দোষগুণ হয় না। এই দোষগুণ তাহাদের জাতেরই স্বভাব।

কোন্ পাখী কি-রকমে উড়িতেছে এবং কি করিয়া দিন কাটাইতেছে তাহা বোধ করি তোমরা ভালো করিয়া দেখ নাই। এইবারে লক্ষ্য করিয়ো, দেখিবে আমাদের জানাশোনা পাখীদের মধ্যে কাক, শকুন, চিল, মাছরাঙা, বাবুই ও তালচোঁচ্ পাখীরা কখনই চুপ্ করিয়া বসিয়া

থাকিতে পারে না। শকুনেরা সকালের চিক্‌মিকে রৌদ্রে দুই-একবার ডানা খুলিয়া সেগুলিকে শুকাইয়া লয়। তার পরেই ইহারা উড়িতে আরম্ভ করে। ভাগাড়ে মরা জন্তুজানোয়ার দেখিতে না পাইলে তাহারা আর নামেই না। এই রকমে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা উড়িয়াই বেড়ায়। বাবুই, তাল্‌চোঁচ্‌দের লক্ষ্য করিলে তাহাদিগকে তোমরা চুপ্‌ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিবে না—কাজে এবং বিনা কাজে উড়িয়া বেড়াইতে ইহারা একটুও ক্লান্ত হয় না। কিন্তু ফিঙে ও বুল্‌বুলের কথা মনে করিয়া দেখ,—ইহারা প্রায়ই অলস লোকের মতো ঝাড়ের শুক্‌না বাঁশের ডগায় বা গাছের শুক্‌না ডালে ভালো মানুষটির মত বসিয়া থাকে এবং মাঝে মাঝে ঘাড় বাঁকাইয়া সাম্‌নে পিছনে এবং আশে-পাশে তাকাইতে থাকে; তার পর যেই, কোনো পোকামাকড়কে উড়িতে দেখে অমনি তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আমরা এখানে কেবল দুই তিনটি পাখীর উড়ার কথা বলিলাম। মাঠেঘাটে বাগানে তোমরা কত পাখীই দেখিতে পাও। তাহাদের উড়াবসা এবং চালচলন লক্ষ্য করিয়ো; দেখিবে, ইহাদের এক-এক জাতির উড়ার এক-একটা ভঙ্গী আছে।

পাখীরা উড়িবার সময় লেজ দিয়া কি কাজ চালায়, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। লেজের আকৃতি কি সকল

পাখীর একই রকমের। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, নানা পাখীর লেজের আকৃতি নানারকম। লেজের চেহারা দেখিয়া পাখীরা কি-রকমে উড়ে তাহা অনেক সময়ে বলা যায়।

খুব লম্বা-লেজ-ওয়ালা কতগুলি পাখীর তোমরা নাম জানো? ছেলেবেলায় যখন খেলায় মত্ত থাকিয়া ভাত খাইতে চাহিতাম না, তখন মা লেজ-ঝোলার ভয় দেখাইয়া আমাদের ভাত খাওয়াইতেন। আজও সে-কথা মনে আছে। তোমরা লেজ-ঝোলা পাখী দেখ নাই কি? হাঁড়িচাঁচা পাখীর খুব লম্বা লেজ আছে। ফিঙে, টুন্‌টুনি, তালচোঁচ্, ধনেশ, শ্যামা, কোকিল, কুকো, টিয়া, ইহাদেরও লেজ কম লম্বা নয়। কিন্তু সকলের চেয়ে লম্বা লেজ আছে সা-বুল্‌বুল্ পাখীর। তোমরা এই পাখী দেখ নাই কি? লম্বা লেজের ভারে বেচারীরা ভালো করিয়া উড়িতেই পারে না। তোমরা পাখীদের উপরে নজর রাখিলে, লম্বা-লেজওয়ালা আরো অনেক পাখীর নাম বলিয়া দিতে পারিবে।

পাখীমাত্রেরই গলা লম্বা এবং অনেকের আবার পাগুলিও লম্বা। এইজন্য গলা ও পা লইয়া পাখীরা বড় মুস্কিলে পড়ে। তাই উড়িবার সময়ে শরীরটা যাহাতে সাম্‌নে পিছনে বা পাশে ঝুঁকিয়া না পড়ে, তাহার

জন্য উহারা গলা ও পাগুলিকে নানা ভঙ্গীতে রাখিয়া উড়িয়া বেড়ায়। তোমরা বোধ করি ইহা লক্ষ্য কর নাই।

হাঁসেরা কি-রকমে উড়ে, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবির হাঁসটি গাছের কোটরের বাসায়

হাঁসের উড়িবার ভঙ্গী

আসিবার জন্য উড়িতেছে। সে গলা এগাইয়া দিয়াছে। হাঁস, সারস, পানকৌড়িরা ঠিক্ এই-রকমে গলা সোজা রাখিয়া উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু বকেরা এ-রকম ভঙ্গীতে উড়ে না। উড়িবার সময়ে ইহারা লম্বা গলাগুলিকে পিছাইয়া ঘাড়ের উপরে রাখে। সন্ধ্যার সময়ে তোমাদের পুকুর হইতে যখন বকেরা উড়িয়া বাসার দিকে যাইবে, তখন তোমরা লক্ষ্য করিলে ইহা দেখিতে পাইবে।

পাখীদের উড়িবার বেগ

রেলের গাড়ি ঘণ্টায় ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ মাইল বেগে চলে। আমেরিকার কোনো কোনো ডাক-গাড়িকে ঘণ্টায় এক শত মাইল পর্য্যন্ত চলিতে দেখা যায়। আজকালকার হাওয়া-গাড়ি ও উড়ো-জাহাজ প্রায় এক শত মাইল ঘণ্টায় চলিতে পারে। পাখীরা কি-রকম বেগে আকাশে উড়িয়া বেড়ায় এখন তোমাদিগকে সেই কথা বলিব। আলাবিল পাখী তোমরা দেখিয়াছ। ইহারা ঘরের বারান্দায় বাসা করে। তালচোঁচ্‌দের মতো; উড়িয়া উড়িয়া পোকামাকড় খায়। এই পাখীরা ঘণ্টায় এক শত মাইল বেগে উড়িতে পারে। পায়রাদের উড়িবার বেগও কম নয়। তোমরা বোধ হয় জানো, যুদ্ধের সময়ে আগে পোষা-পায়রার গলায় চিঠিপত্র বাঁধিয়া দূরদেশে খবর দেওয়া-নেওয়া হইত। যেখানে পালন করা যায়, সে জায়গা পায়রা সহজে ছাড়িতে চায় না। খুব দূরে চোখ বাঁধিয়া লইয়া গেলেও, বেশ পথ চিনিয়া নিজের খোঁপে ফিরিয়া আসে। এই রকমে পোষা পায়রা দিয়াই আগে পত্র দেওয়া-নেওয়া

হইত। এখন বিনা-তারে টেলিগ্রাম্ পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে; তাই পায়রা দিয়া খবর পাঠানো হয় না। যাহা হউক, পায়রারাও ঘণ্টায় আশী-নব্বুই মাইল বেগে উড়িতে পারে। আমেরিকার এক রকম ছোটো পাখী যখন বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হয়, তখন এক রাত্রিতে দেড় হাজার মাইল চলিয়াছে দেখা গিয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমাদের রেল-গাড়ির যতই বেশি বেগ হউক, কোনো কোনো পাখীর সহিত পাল্লা লাগিলে রেল-গাড়িই হারিয়া যায়। সন্ধ্যার সময়ে কাক-বকের দল যখন মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যায়, তখন লক্ষ্য করিলে দেখিবে, তাহারা সাধারণ রেল-গাড়ির চেয়ে কম বেগে চলে না।

পাখীদের আহার

পাখীরা যে কত-রকম জিনিস খায়, তাহা বলিয়াই শেষ করা যায় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাছ মাংস পোকা-মাকড় ইঁদুর ব্যাঙ্ কিছু ছাড়ে না,—কাছে পাইলেই সেগুলিকে খাইয়া ফেলে। আবার কোনো কোনো পাখী ঘোর সাত্বিক, তাহারা মাছ বা মাংস ছোঁয় না,—পাকা ফল, ধান, যব বা গম খাইতে ভালবাসে। তোমাদের পোষা টিয়া পাখী কি খায়, দেখ নাই কি? ছোলা ভিজা, কাঁচা লঙ্কা বা ফল খাইতে দিলে তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলে, কিন্তু পোকা-মাকড় কাছে দিলে খায় না। কাক বড় মজার পাখী; মাছ-মাংস, ফলমূল, ভাত-তরকারি এমন কি খুব নোংরা জিনিসও তাহারা আনন্দে খাইয়া ফেলে। যাহারা আমিষ ও নিরামিষ দুই রকম খাবারই খায়, এ-রকম পাখী অনেক আছে। তোমাদের বাড়ীতে যদি পোষা ময়না থাকে, দেখিয়ো, সে যেমন ছোলার ছাতু ও দুধ খায়, তেমনি দুই-চারিটা ছোটো পোকা কাছে দিলেও তাহা খাইয়া ফেলে।

ভিন্ন ভিন্ন পাখীর খাবার সংগ্রহের উপায়ও ভিন্ন রকম দেখা যায়। কাক, বক, শালিক, চড়াই, দয়েল, খঞ্জন, কুকো, ঘুঘু, পায়রা, শকুন, হাঁস, মুরগী, ছাতারে ইহারা সকলেই মাটির উপরে বেড়াইয়া খাবার জোগাড় করে। চিলেরা কিন্তু প্রায়ই মাটিতে বেড়াইয়া খাবার সন্ধান করে না। ইহারা গাছের আগ-ডালে বা বাড়ীর ছাদের খুব উঁচু জায়গায় চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকে। তার পরে মাটির উপরে কোনো খাবার দেখিলে তাহা ছোঁ মারিয়া ধরে এবং গাছের মাথায় বসিয়া খায়। নীলকণ্ঠ পাখীও কতকটা এই-রকমে খাবার জোগাড় করে। বাবুই তাল-চোঁচ্ ও ফিঙে প্রভৃতি পাখীরা আবার উড়িতে উড়িতেই মশা মাছি ও প্রজাপতির মতো ছোটো পোকাদের ধরিয়া মুখে পোরে। তালচোঁচ্ ও বাবুই পাখীরা সকালে ও সন্ধ্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে কি-রকমে উড়িয়া বেড়ায়, তাহা বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। দেখিলে মনে হয় বুঝি, পাখীর দল উড়িয়া খেলা করিতেছে,—কিন্তু তাহা নয়, উহারা পোকা ধরিয়া খাইবার জন্য ঐ-রকমে উড়িয়া বেড়ায়। এই-সব পাখীর মধ্যে আবার কেহ কেহ হাঁ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়—উড়ন্ত পোকা মুখের মধ্যে আসিলে কপাৎ কপাৎ করিয়া সেগুলিকে গিলিয়া ফেলে।

মাছরাঙা, কুল্লো, শঙ্খচিল, গাংচিল, গগনভেরী ইহারা সকলেই মাছ খাইতে ভালবাসে, কিন্তু মরা মাছ পছন্দ করে না। ইহাদের মধ্যে কেহ উপর হইতে ছোঁ মারিয়া কেহ-বা জলে নামিয়া জ্যান্ত মাছ ধরিয়া খায়। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই মাছ খাইবার এক-একটা রকম আছে। মাছরাঙা যদি কোনো গতিকে বড় মাছ শিকার করিতে পারে, তবে সেটিকে মাটিতে বা গাছের ডালে আছ্‌ড়াইয়া মারিয়া খায়; কিন্তু ছোটো মাছ টপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলে। আবার চিলেরা পায়ের নখ দিয়া শিকার ধরিয়া গাছের ডালে বসে এবং তার পরে পায়ে আট্‌কাইয়া সেটিকে ছিঁড়িয়া খায়।

গাছপালার পাতায় যে-সব পোকা-মাকড় লুকাইয়া থাকে, অনেক পাখী গাছে থাকিয়াই সেগুলিকে খুঁজিয়া খায়। টুন্‌টুনি ও মধুচোষা পাখীরা পাতার আড়ালে লুকাইয়া ঐ-রকমে খাবার জোগাড় করে। ইহারা ছোটো পোকার বড় ভক্ত।

কাঠ্‌ঠোক্‌রাদের খাবার সংগ্রহ করা আবার অন্য রকমের। টিক্‌টিকিরা যেমন দেওয়ালের গায়ে পা আট্‌কাইয়া পোকামাকড় ধরিয়া খায়, ইহারাও গাছের ডালে নখ আট্‌কাইয়া সেই রকমে পচা ডালপালার মধ্যে যে পোকা থাকে তাহা ধরিয়া খায়। বসন্তবউরি

পাখীকেও কখনো কখনো গাছের গা আঁকড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। তাই মনে হয়, ইহারাও বুঝি কাঠ্‌ঠোকরাদের মতো পোকা ধরিয়া খায়। কিন্তু বসন্তবউরিদের ঠোঁট কাঠ্‌ঠোকরাদের মতো লম্বা নয়।

চোর-ডাকাতেরা অতি ভয়ানক লোক। আমরা বহু কষ্টে যে টাকা-কড়ি জমাইয়া ঘরে রাখি, হঠাৎ এক রাত্রিতে ডাকাত আসিয়া তাহা লুটপাট করিয়া লইয়া যায়। দেখ, ইহা কত অন্যায়। পাখীদের মধ্যেও কিন্তু চোর-ডাকাত আছে। কাকেরা ভয়ানক চোর এবং চিলেরা ভয়ানক ডাকাত। বেচারি মাছরাঙা হয়ত বহু কষ্টে একটা মাছ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, অমনি একটা কাক বা চিল কোথা হইতে আসিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। এই অবস্থায় বেচারি মাছরাঙার মনটা কি-রকম হয় বল দেখি। সে লজ্জায় ও দুঃখে কাতর হইয়া পড়ে। যদি পাখীদের আইন-আদালত থাকিত, তাহা হইলে মাছরাঙারা প্রতিদিনই কাক ও চিলদের নামে মোকদ্দমা রুজু করিত।

পাখীদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস

পাখীদের চালচলন ও আকৃতি-প্রকৃতির মোটামুটি কথাগুলি তোমাদিগকে বলিলাম। উহারা কি-রকমে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায় এখন সেই কথা তোমাদিগকে বলিব।

আমরা দিনে কতই-বা পরিশ্রম করি। ছয় সাত ঘণ্টা মাটি কোপাইলে বা পথ চলিলে খুব জোয়ান লোকও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা না ঘুমাইলে শরীরে আর বল পাওয়া যায় না। কিন্তু পাখীরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কত পরিশ্রম করে ভাবিয়া দেখ দেখি। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই স্বভাব এমন ছট্‌ফটে যে জোর পাঁচ ছয় মিনিটের বেশি তাহারা এক ডালের এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারে না। এখনি যে কাকটিকে তোমরা তাল-গাছের মাথায় বসিয়া থাকিতে দেখিতেছ এক মিনিট পরেই হয়ত সে উড়িয়া বাঁশ ঝাড়ের মাথায় বসিয়া দোল খাইতে থাকিবে। আমরা বিনা কাজে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাই না।

পাখীরা কেন যে অকাজে ঐরকমে এক গাছের মাথা হইতে আর এক গাছের মাথায় বসে, তাহা উহারাই জানে। আমরা একটু দৌড়াইলে বা বেশি ক্ষণ ফুটবল্ খেলিলে হাঁফাইয়া পড়ি। তখন শরীরের ভিতরে বেশি পরিমাণে ভালো বাতাস লওয়া দরকার হয়। তাই আমরা ঘন ঘন নিশ্বাস লইতে থাকি। পাখীরা কিন্তু সর্ব্বদাই ঘন ঘন নিশ্বাস লয়। উহারা যে-রকম পরিশ্রম করে, তাহাতে কেবল ঘন নিশ্বাস দ্বারা সুস্থ থাকে না। তাই অন্য জন্তুদের তুলনায় পাখীদের শ্বাসযন্ত্রের ব্যবস্থা কিছু আলাদা রকমের।

আমরা যেমন নাক দিয়া নিশ্বাস টানিয়া শরীরের ভিতরকার ফুস্‌ফুসে লইয়া যাই, পাখীরাও তাহাই করে। ইহাদেরো ফুস্‌ফুস্ আছে। কিন্তু তাহা আমাদের ফুস্‌ফুসের মতো নয়।

পাখীর ফুস্‌ফুস

এখানে পাখীদের ফুস্‌ফুসের একটা ছবি দিলাম। ইহা উহাদের শিরদাঁড়া ও পাঁজরার হাড়ের সঙ্গে বুকের ভিতরে আঁটা থাকে। আমরা নাকে দিয়া যে বাতাস টানি তাহা ফুস্‌ফুসে থাকিয়াই রক্ত পরিষ্কার করে এবং তার পরে

সেখান হইতে শরীরের বদ্ বাতাস লইয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহিরে আসে। কিন্তু পাখীদের নিশ্বাসের বাতাস কেবল ফুস্‌ফুসে গিয়াই ফেরাঘোরা করে না—শরীরের নানা জায়গায় যে-সব বাতাসের থলি আছে, উহা সেখানে গিয়া বদ্ রক্তকে পরিষ্কার করে। কখনো কখনো ঐ বাতাস হাড়ের ভিতর গিয়াও পৌঁছায়। পাখীদের শরীরের ভিতরকার বাতাসের থলি খুব পাত্‌লা চামড়া দিয়া তৈয়ারি।

ফুস্‌ফুসের ছবিতে যে গর্ত্ত দেখিতেছ, নিশ্বাসের বাতাস ঐ সকল পথ দিয়া বাতাসের থলিতে ও হাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে। তাহা হইলে দেখ, পাখীদের শরীরের অস্থি-সন্ধিতে বাতাস আনাগোনা করে। ইহাতে দুইটা কাজ হয়,—ইহাতে পাখীদের শরীরের বদ্ রক্ত পরিষ্কার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর হাল্কা হয়। গ্যাসে-ভরা তোমাদের খেলার বেলুনগুলি কেমন হাল্কা তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ছাড়িয়া দিলেই সেগুলি আপনিই আকাশের উপরে উঠিতে থাকে। পাখীদের শরীর ততটা হাল্কা না হইলেও, ভিতরে গরম বাতাস পোরা থাকে বলিয়া তাহা অন্য জন্তুর শরীর অপেক্ষা অনেক হাল্কা।

পাখীদের গায়ের তাপ

তোমরা পাখীর পালকের ভিতরকার চামড়ায় হাত দিয়া দেখিয়াছ কি ? খুব জ্বর হইলে আমাদের গা যেমন গরম হয়, পাখীদের গা সর্ব্বদাই তাহার চেয়েও অনেক বেশি গরম থাকে। জ্বর হইলে তোমাদের গা ৯৯ ডিগ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া কখনো কখনো ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত গরম হয়। ডাক্তার মহাশয় থার্ম্মোমিটার বগলে লাগাইয়া কি-রকমে এই তাপ পরীক্ষা করেন, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কিন্তু পাখীদের শরীরে থার্ম্মোমিটার লাগাইলে তাপ প্রায় ১১২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের শরীরে এত তাপ এবং সর্ব্বদা উড়িয়া বেড়াইবার শক্তি কোথা হইতে আসে, তোমাদিগকে তাহা বলিব।

রেল-গাড়ি, হাওয়া-গাড়ি, উড়ো-জাহাজ কিসের জোরে এত তাড়াতাড়ি চলে, তোমরা তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? এগুলির মধ্যে যে কল আছে, তাহাতে কয়লা বা তেল পুড়িয়া যে শক্তি জন্মে, তাহাই উহাদের চালায়। কয়লা না পোড়াইলে রেল-গাড়ি ও ষ্টীমার চলে না,

পেট্রোল তেল না পোড়াইলে হাওয়া-গাড়িকে নড়ানো যায় না। হাওয়া-গাড়ির কলে যে পেট্রোল থাকে, তাহা কলের ভিতরকার বিদ্যুতে জ্বলিয়া উঠে এবং তার পরে বাতাসের অক্সিজেনে তাহা কলের ভিতরে পুড়িতে আরম্ভ করে। এই রকমে পেট্রোল হইতে যে শক্তি জন্মে, তাহাতেই হাওয়া-গাড়ি চলে। পাখী ও জন্তু-জানোয়ারের শরীরের মধ্যেও ঠিক এই রকম জ্বলা ও পোঁড়ার ব্যাপার আছে। প্রাণীরা যে-সব জিনিস খায়, তাহাতে অনেক শক্তি লুকানো থাকে। তার পরে তাহা নিশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া শরীরে তাপ ও শক্তির সৃষ্টি করে। পাখীদের শরীরে তোমরা যে তাপ ও শক্তি দেখিতে পাও, তাহা খাবার জিনিসের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন মিশিয়াই উৎপন্ন হয়। পাখীদের শরীরের ভিতরে বাতাসের অভাব নাই, ফুসফুস, গায়ের মাংস, এমন কি হাড়ের ছিদ্র বাতাসে ভরা থাকে। তাই এই-সব বাতাসের অক্সিজেন খাবারের সঙ্গে মিশিয়া এত বেশি তাপের সৃষ্টি করে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, পাখীদের গায়ে এত তাপের দরকার কি? দরকার অবশ্যই আছে। দারজিলিং পাহাড়ে শীত বেশি বলিয়া আমরা কলিকাতা হইতে সেখানে যাইতে হইলে কত গরম জামা, কত গরম র‍্যাপার

সঙ্গে লই। শীতের দেশে গরম কাপড় গায়ে না দিলে শরীরের তাপ রক্ষা করা যায় না,—ভয়ানক শীত লাগে। পাখীরা কত উঁচুতে উড়িয়া বেড়ায় তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। নীচের বাতাসের চেয়ে আকাশের উপরকার বাতাস খুব ঠাণ্ডা। পাখীদের গা গরম জামার মতো পালকে ঢাকা থাকে বলিয়াই তাহারা উপরকার আকাশে এত ঠাণ্ডায় অনায়াসে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। শকুনরা ছয় মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে পারে। হিমালয় পাহাড়ের খুব উঁচু শেখর ধবলাগিরি পাঁচ মাইলের একটু বেশি উঁচু। তাহা হইলে দেখ, শকুনরা ধবলা-গিরির উচ্চতাকেও ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারে। গায়ে বেশি তাপ না থাকিলে, তাহারা অত উঁচুতে শীতেই মারা যাইত। তোমরা গের-বাজ পায়রা দেখিয়াছ কি? ইহারাও অনেক উঁচুতে উড়িতে পারে। আমাদের এক জোড়া গের-বাজ ছিল, তাহারা উড়িতে উড়িতে এত উপরে উঠিত যে, তাহাদিগকে চোখে দেখাই যাইত না।

পাখীদের নাড়ীভুঁড়ি

কেরোসিন তেল বা পেট্রোলে যে শক্তি জড় করা থাকে, তাহা দিয়া মোটর ও উড়ো জাহাজ চলে, এবং প্রাণীদের খাবারের ভিতরে যে শক্তি লুকানো থাকে, তাহাতে উহাদের গায়ে তাপ হয়। এই কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। কেরোসিন ও পেট্রোল কোথা হইতে পাওয়া যায়, তাহা বোধ করি তোমরা সকলে জানো না। এগুলি মাটির তলার জিনিস। অনেক কষ্টে সেখান হইতে উঠাইয়া নানা রকমে পরিষ্কার করিলে তাহা জলের মতো কেরোসিন ও পেট্রোল হইয়া দাঁড়ায়। মাটির তলায় যে অপরিষ্কার কেরোসিন পাওয়া যায় তাহাকে কেরোসিন বলিয়াই চেনা যায় না এবং তাহা দিয়া কল চালানোর কাজও ভালো করিয়া হয় না। আমরা ভাত ডাল তরকারি প্রভৃতি যে-সব খাবার খাই এবং পাখীরা পোকামাকড় ধান গম প্রভৃতি যে-সব জিনিস খায়, তাহাদের সঙ্গের বাতাসের অক্সিজেন মিশিয়া তাপ বা শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। কেরোসিন যেমন

পরিষ্কার না হইলে ভালো জ্বলে না, আমাদের খাবার-গুলিও পেটের ভিতর হজম হইয়া বেশ খাঁটি না হইলে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়া তাপ ও শক্তি জন্মাইতে পারে না। প্রাণীদের হাব্জা-গোব্জা খাবার শরীরের ভিতরে গিয়া যে যন্ত্রের দ্বারা কাজের উপযুক্ত হয়, তাহাই নাড়ীভুঁড়ি।

এখানে পাখীদের নাড়ীভুঁড়ির একটা ছবি দিলাম। ছবির উপরের দিকে যে নলটি দেখিতেছ তাহা কণ্ঠনালী। খাবারের জিনিস এই পথ দিয়াই মুখ হইতে শরীরের ভিতরে যায়। এই নলের একটু নীচে যে একটা থলি দেখিতেছ, ইহা পাখীদের প্রথম পাকাশয়। আমরা যেমন খাবারের জিনিস ভাণ্ডারে জমা রাখি, পাখীরা খাবার গিলিয়াই কিছুক্ষণের জন্য তাহা ঐ থলিতে জমা রাখে। তোমাদের যদি পোষা পায়রা থাকে, তবে তাহার গলার নীচেটা একটু টিপিলেই তোমরা এই থলিটার সন্ধান পাইবে।

পাখীর নাড়ীভুঁড়ি

থলিতে যে ধান চাল প্রভৃতি খাবার বোঝাই থাকে

টিপিলেই তাহা বুঝা যায়। এই পাকাশয়ে কিন্তু খাবারের জিনিস বিশেষ রকমে হজম হয় না—মুখের লালায় মিশিয়া সেগুলি একটু নরম হয় মাত্র।

যাহা হউক, গলার থলি অর্থাৎ প্রথম পাকাশয় হইতে খাবারের জিনিস ধীরে ধীরে নামিয়া ছবিতে নলের মতো যে মোটা অংশ দেখিতেছ সেখানে উপস্থিত হয়। ইহাই পাখীদের দ্বিতীয় পাকাশয়। এখান হইতে খাবারের জিনিস নামিয়া আরো নীচেতে যে বড় থলিটি রহিয়াছে সেখানে হাজির হয়। ইহা পাখীদের তৃতীয় পাকাশয়। এই পাকাশয়টি বড় মজার জিনিস। ইহার ভিতরটা প্রায় হাড়ের মতো এক রকম শক্ত জিনিসে মোড়া থাকে। আমরা মটর যব গম ইত্যাদি যে যাঁতায় ফেলিয়া গুঁড়া করি, ইহা যেন সেই রকমের একটা যাঁতা। পাখীরা ছোলা মটর যব গম প্রভৃতি যে-সব খাবার খায় এই যাঁতা কলে পড়িলে গুঁড়া হইয়া যায়। তোমরা বোধ হয় জানো না, পায়রা প্রভৃতি যে-সব পাখী শস্য খায় তাহারা খাবার খুঁটিবার সময়ে ছোটো পাথরের টুক্‌রা বা কাঁকর ঠোঁটে লইয়া গিলিয়া ফেলে। এই সব কাঁকর তৃতীয় পাকাশয়ে জমা হয়। তার পরে সেখানে ধান চাল ছোলার মতো শক্ত খাবার আসিয়া পৌঁছিলেই সেই সকল পাথরের টুক্‌রা বা কাঁকর খাবারের উপর এমনি

জোরে চাপ দেয় যে, সেগুলি গুঁড়া হইয়া যায়। কাজেই, পাখীদের তৃতীয় পাকাশয়টিকে যাঁতা-কলই বলিতে হয়। যে-সব পাখী শস্য খায়, তাহাদের তৃতীয় পাকাশয়গুলিকে বেশ বড় দেখা যায়। উট্ পাখীর তৃতীয় পাকাশয়ের যাঁতা কল এমনি জোরালো যে, লোহা বা কাঁচ প্রভৃতির মতো শক্ত জিনিস সেখানে পড়িলে গুঁড়া হইয়া যায়। চিল শকুন প্রভৃতি মাংসাহারী পাখীদের দ্বিতীয় পাকাশয়টিই বড় থাকে। ইহাতে যে হজমি রস জমা হয়, তাহাতে মাছ মাংস প্রভৃতি অল্পক্ষণের মধ্যে হজম হইয়া যায়।

তৃতীয় পাকাশয়ের গা হইতে যে সরু নল ছবিতে আঁকা আছে, তাহাই পাখীদের অন্ত্র। হজম-করা খাদ্য তৃতীয় পাকাশয় হইতে এখানে আসিয়া জমা হয়। ছবির বাঁ ধারে যে ডিমের মতো গোল জিনিষটা দেখিতেছ, উহা পাখীদের যকৃৎ। পাখীর দেহের তুলনায় যকৃৎ খুব বড়। যকৃতের গায়ে পিত্ত-কোষ আছে, তাহা হইতে অন্ত্রে পিত্তরস আসিয়া খাবারকে হজম করে। ইহা ছাড়া হজমের জন্য আরো দুই একটি রস অন্ত্রে আসিয়া জমে। খাবার অন্ত্রে আসিয়া সম্পূর্ণ হজম হইলে তাহার সার জিনিসটা শরীরে চুষিয়া লয় এবং অনাবশ্যক অসার জিনিসটা অন্ত্রের শেষ প্রান্ত দিয়া শরীরের বাহিরে আসে। ছবির সকলের নীচে অন্ত্রের আবর্জ্জনা বাহির

হইবার পথটি দেখিতে পাইবে। ইহাই মল-ত্যাগ ও ডিম-প্রসবের পথ। মলমূত্র ত্যাগ ও ডিম প্রসবের জন্য পাখীদের দেহে পৃথক্ পথ নাই। বিষ্ঠার সঙ্গেই ইহারা মূত্র ত্যাগ করে। ইউরিক এসিড্ নামে এক রকম অম্ল জিনিস পাখীদের মূত্রে অনেক পরিমাণে থাকে। শুকাইয়া গেলে ইহার রঙ্ সাদা-সাদা হয়। পাখীদের বিষ্ঠায় সে সাদা অংশটা পৃথক্ দেখা যায়, তাহাই উহাদের জমাট মূত্র।

পাখীদের ডিম

ছাগল গরু ভেড়া যেমন ছোটো বাচ্চা প্রসব করে,—পাখীরা তাহা করে না। ইহারা ডিম প্রসব করে এবং সেই ডিম হইতে যে বাচ্চা বাহির হয়, তাহা পালন করে। ইহা তোমরা সকলেই জানো। সাপ কচ্ছপ মাছ ও ব্যাঙেরা ডিম প্রসব করিয়া সেগুলির যত্ন করে না এবং ডিম হইতে যে-সব বাচ্চা বাহির হয়, তাহাদের খোঁজও লয় না। পাখীরা কিন্তু সে-রকম নয়। ডিম প্রসব করিবার আগে তাহারা অনেক কষ্ট করিয়া বাসা তৈয়ারি করে এবং সেই-সব বাসায় ডিম প্রসব করে। তার পরে কেহ এক মাস, কেহ কুড়ি দিন, কেহ বা বারো দিন দিবারাত্রি ডিমের উপর বসিয়া সেগুলিকে গরমে রাখে। এত যত্ন এবং এত চেষ্টাতেই পাখীদের ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। কিন্তু বাচ্চা হইলেই পাখীরা নিশ্চিন্ত হয় না। বাচ্চারা যত দিন ভালো করিয়া উড়িতে না পারে এবং খাবার খুঁটিয়া খাইতে না শিখে পাখীরা

তত দিন সেগুলিকে খুব সাবধানে কাছে পিঠে রাখে এবং নিজেরা না খাইয়া তাহাদের খাওয়ায়।

তোমরা কত রকম পাখীর ডিম দেখিয়াছ জানি না। হয় ত হাঁস বা পায়রার ডিম ছাড়া অন্য পাখীর ডিম দেখ নাই। তোমরা যদি নানা পাখীর ডিম পরীক্ষার সুযোগ পাও, তবে দেখিবে প্রত্যেক রকম পাখীর ডিমের চেহারা ও রঙ্ পৃথক্। তাই যাঁহারা পাখী লইয়া পরীক্ষা করেন, তাঁহাদের কাছে কোনো একটা ডিম লইয়া গেলে, তাহা কোন্ পাখীর ডিম তাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন।

অধিকংশ পাখীর ডিমই গোলাকার। কিন্তু ঠিক্ মার্বেল বা বলের মতো গোলাকার নয়,—তাহার দুই দিক্ ছুঁচ্‌লো। এই দুই দিকের মধ্যে আবার একটা দিক্‌কে বেশি ছুঁচ্‌লো হইতে দেখা যায়। তোমরা একটা হাঁসের ডিম লইয়া দেখিয়ো, তাহা হইলে পাখীদের ডিমের সাধারণ আকৃতি বেশ বুঝিতে পারিবে। করমচা ফল তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ডিমের আকৃতি কতকটা করমচার মতো নয় কি?

যাহা হউক, ডিমের আকৃতি ঠিক গোলাকার না হইয়া এমন অদ্ভুত রকমের হয় কেন, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। এক-একটা ছোটো বাসায় পাখীরা অনেক-গুলি করিয়া ডিম প্রসব করে। যাহাতে অল্প জায়গায়

অনেক ডিম আঁটানো যায়, তাহারি জন্য ডিমের আকৃতি ভাঁটার মতো গোল না হইয়া করমচার মতো লম্বাটে হয়। ঠিক্ গোলাকার ডিম যে-রকমই সাজানো হউক না কেন, ডিমগুলির মাঝে অনেকটা জায়গা ফাঁকা থাকিয়া যায়। কিন্তু লম্বাটে ডিমে তাহা হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া সকল পাখীরই ডিম যে লম্বা একথা বলা যায় না। তোমরা পেঁচা ও মাছরাঙা পাখীর ডিম বোধ করি দেখ নাই। ইহাদের ডিম প্রায় গোলকার।

ডিমের রঙ্

পাখীদের ডিমের রঙ্ যে কত রকম হয়, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াই শেষ করিতে পারিব না। সাত-ভাই অর্থাৎ ছাতারে পাখী তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কি বিশ্রী পাখী! গায়ের রঙ্ মাটির মতো; চোখ পা ঠোঁট সবই সাদা,—দেখিলেই বোধ হয় পাখীগুলো বহুকাল অসুখে ভুগিয়াছে, তাই বুঝি গায়ে রক্ত নাই। কিন্তু চোখের চাহনি দেখিলেই মনে হয়, যেন পাখীগুলা ভয়ানক দুষ্ট। যাহা হউক, এমন বিশ্রী পাখীর ডিমগুলি হয় কিন্তু সুন্দর। ইহাদের ডিমের নীল রঙ্ দেখিলেই যেন দুই চোখ জুড়াইয়া যায়।

লম্বা লেজওয়ালা হাঁড়িচাঁচা পাখী তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ইহারা গাছের খুব উঁচু ডাল ভিন্ন বাসা করে না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাদের বাগানে খোঁজ করিলে হয় ত হাঁড়িচাঁচার বাসা দেখিতে পাইবে। ইহাদের ডিমগুলিতে সবুজ বা গোলাপী ছিটা-ফোঁটা দেখা যায়।

শালিকের ডিম হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। ইহারা অযত্নে বাসা তৈয়ারি করে বলিয়া প্রায়ই বাসার নীচে ডিম পড়িয়া ভাঙিয়া যায়। তোমরা শালিকের বাসার নীচে ডিমের ভাঙা খোলা দেখ নাই কি ? শালিকের ডিমগুলি হয় হাল্কা নীল রঙের। গায়ে ছিটা-ফোঁটা থাকে না।

এই রকম এক-রঙা ডিম আরো অনেক পাখীর দেখা যায়। কুকো টিয়া বাজ বাবুই পেঁচা কাঠ্‌ঠোক্‌রা ও ঘুঘুদের ডিম একেবারে সাদা হয়। তোমরা বোধ হয় মনে কর, হাঁসদের ডিমও সাদা। কিন্তু তাহা নয়, ইহাদের অনেক ডিমের মধ্যে দুই-চারিটার রঙ্‌ প্রায়ই ফিকে নীল হইতে দেখা যায়। ফটিক-জল পাখী তোমরা হয় ত দেখ নাই। ইহারা চড়াই পাখীর চেয়ে বড় হয় না। গরমের দিনে দুপুর বেলায় পাতার আড়ালে বসিয়া ইহারা ডাকে; খোঁজ করিয়া দেখা কঠিন। ইহাদের ডিমের রঙ্‌ কতকটা ধূসর রঙের।

আমরা সর্ব্বদা যে-সব পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে বুল্‌বুল্‌ই প্রধান। একবার বাগানে খোঁজ করিলে দু'-একটা বুল্‌বুল্‌ প্রায়ই দেখা যায়। ইহাদের ডিমের রঙ্‌ কিন্তু বড় সুন্দর। ইহাতে গোলাপী রঙের উপরে লালের ছিটা-ফোঁটা থাকে। খঞ্জন পাখী হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। ইহারা বড়ই চঞ্চল,—ক্রমাগত লেজ নাড়িয়া

মাটির উপর পোকামাকড়ের সন্ধান করে। ইহাদের ডিমের উপরে খয়েরি রঙের ছিটাফোঁটা থাকে। মধু-চোয়া পাখীদেরও ঐ-রকম ডিম দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি আকারে অনেক ছোট হয়।

ফিঙেদের ডিম বড় মজার। ইহারা কখনো সাদা, আবার কখনো খয়েরি রঙের ছিটা-ফোঁটা দেওয়া ডিম প্রসব করে। চড়াই পাখীদেরও ডিমের রঙের স্থিরতা দেখা যায় না। ইহাদের ডিমগুলি কখনো সাদা এবং কখনো নীল হয়, আবার তাহার উপরে খয়েরি ছিটা-ফোঁটাও থাকে। শিকরার ডিমের রঙ্ নীল, কতকটা যেন ছাতারেরই ডিমের মতো। কিন্তু আকারে বড়। কাক ও কোকিলের ডিমও নীল। কিন্তু এক রকমের নীল নয়। কাকের ডিমে যেন একটু সবুজের আমেজ আছে।

তোমরা বোধ হয়ত ভাবো ডিমের মধ্যে হাঁসের ডিমই বুঝি সব চেয়ে বড়। কিন্তু তাহা নয়, অষ্ট্রিচ্ অর্থাৎ উঠ-পাখীর ডিম সকলের চেয়ে বড়। দুই হাজার বৎসর আগে মাদাগাস্কার দ্বীপে এক রকম প্রকাণ্ড পাখী দেখা যাইত। শিকারীদের উৎপাতে সে পাখী এখন আর একটিও দেখা যায় না। ইহার নাম ছিল "হাতী পাখী"। আমরা যেমন কলসীতে জল রাখি, মাদাগাস্কারের লোকেরা হাতী

পাখীর ডিমের খোলায় জল রাখিত। ভাবিয়া দেখ সেগুলি কত বড় ছিল। আজও সে দেশের লোকের বাড়ীতে হাতী পাখীর ডিমের খোলা দুই চারিটা দেখা যায়। এক-একটা খোলায় প্রায় দশ সের করিয়া জল আঁটে।

অধিকাংশ পাখীই বৎসরে একবার ডিম পাড়ে। কিন্তু যাহারা বৎসরে দুইবার ডিম প্রসব করে, এ-রকম পাখীও আছে। বক, দোয়েল ও আবাবিল পাখীদের বৎসরে দুইবার ডিম পাড়িতে দেখা যায়। পায়রা, হাঁস, মুরগী এবং ঘুঘুদের ডিম-পাড়ার সময় ঠিক নাই। বৎসরের সকল সময়েই ইহাদের বাসায় ডিম দেখা যায়।

ডিমের সংখ্যা

এক-একবারে পাখীরা যে ডিম পাড়ে, তাহার সংখ্যাও নানারকম দেখা যায়। মাছরাঙা চারিটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। হল্‌দে পাখীর বাসায় তুইটা হইতে চারিটার বেশি ডিম দেখা যায় না। ইহাদের ডিমের উপরে যে লালের ছিটা থাকে, জল লাগিলেই তাহা ধুইয়া যায়। শালিক ও কুকো চারিটা এবং কাকেরা কখনো কখনো ছয়টা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। কিন্তু ঘুঘু ও পায়রার প্রায়ই তুইটার বেশি ডিম দেখা যায় না। বৎসরের মধ্যে অনেক বার ডিম পাড়ে বলিয়া বোধ হয় ইহাদের ডিমের সংখ্যা এত অল্প। পেঁচাদেরও তুইটা করিয়া ডিম হয়। অন্য পাখীরা ভয়ে ইহাদের কাছে ঘেঁসিতে পারে না বলিয়া ইহারা যে তুইটি করিয়া ডিম পাড়ে প্রায়ই তাহা নষ্ট হয় না। শকুনদের বাসায় প্রায়ই একটার বেশি ডিম দেখা যায় না। বুল্‌বুলেরা কখনো তুইটা কখনো-বা তিনটা ডিম পাড়ে।

বাচ্চার জন্ম

হাঁসের ডিম তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ইহার খোলার ভিতরে সাদা ও হল্‌দে রঙের দুইটা জিনিস থাকে। সাদা জিনিসটার নাম লালা, এবং হল্‌দের নাম কুসুম। ডিমের মোটা দিক্‌টার খোলা যদি সাবধানে ঘা দিয়া তোমরা উঠাইতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, খোলার নীচেতে একটা খুব পাতলা চাম্‌ড়া আছে। এই চামড়াটাকে উঠাইলেই ডিমের ভিতরে বাতাসে-ভরা একটু খালি জায়গা দেখা যায়। ইহারি পরে থাকে ডিমের লালা ও কুসুম। ডিমের মোটা দিক্‌টাতেই এই-রকম বাতাসে-ভরা ফাঁকা জায়গা থাকে। ডিমের ভিতরে বাচ্চা জন্মিলে তাহারা ঐ বাতাস টানিয়া লয়।

ডিমের খোলা সাবধানে ফাটাইয়া ভিতরকার লালা ও ও কুসুম কোনো পাত্রে ঢালিলে, এই দুইটা জিনিস যে কি প্রকার তাহা বুঝা যায়। লালা ও কুসুম কখনই ডিমের মধ্যে একত্র মিশানো থাকে না। লালা থাকে

প্রথমে এবং কুসুম থাকে তাহারি মধ্যে ঠিক যেন একটা বলের আকারে। সাবধানে ডিম ভাঙিয়া যদি তোমরা ভিতরের জিনিসটাকে পরিষ্কার পেয়ালায় ঢালিতে পার, তবে হল্‌দে কুসুমের আকৃতিটা দেখিতে পাইবে।

এখানে ডিমের লালা ও কুসুমের একটা ছবি দিলাম।
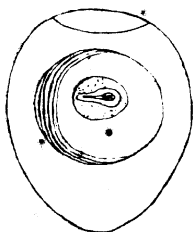
ডিমের লালা ও কুসুম

ছবির সাদা অংশটা লালা ও কালো অংশটা কুসুম। দেখ, ভাঁটার আকারের কুসুমের দুই দিক হইতে দুইটা দড়ার আকারের অংশ জোড়া আছে। ঝাঁকানি পাইলে যাহাতে কুসুম এদিকে ওদিকে সরিয়া না যায়, তাহার জন্য উহা ডিমের ভিতরে থাকে। ডিমের মোটা দিক্‌টায় যে বাতাসে-ভরা ফাঁকা জায়গা থাকে, তাহাও ছবিতে আঁকা আছে।

তার পরে ছবিতে কুসুমের উপরে যে গোলাকার অংশটা আঁকা দেখিতেছ, ডিম ভাঙিলে, তোমরা উহাও দেখিতে পাইবে। এই অংশটাই ডিমের আসল জিনিস। বীজের মধ্যে গাছের যে অঙ্কুর লুকানো থাকে, ইহা যেন তাহারি মতো পাখীর অঙ্কুর। ইহার নাম ভ্রূণ। এই জিনিসটাই ক্রমে বড় হইয়া পাখীর বাচ্চার আকার পায়।

পাখীদের গা কত গরম তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। এই তাপ ডিমের গায়ে না লাগিলে ডিমে বাচ্চা জন্মায় না। তাই পাখীরা ডিমের উপর দিবারাত্রি বসিয়া সেগুলিকে ১১০ ডিগ্রি তাপে রাখে।
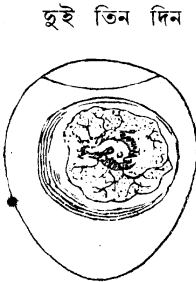
দুই তিন দিন ডিমে তা' দেওয়ার পরে তাহার ভিতরকার অবস্থা কি-রকম হয়, এখানে আর একখানা ছবিতে তাহা আঁকিয়া দিলাম। দেখ, কুসুমের উপরকার ভ্রূণ কত বড় হইয়াছে। আবার শিকড়ের মতো কতকগুলি রক্তের শিরাও জন্মিয়াছে। তোমরা এখন গাছের অঙ্কুরের মতো যেন পাখীর একটা অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। ছবিতেও ইহা আঁকিয়া দিয়াছি। এই অঙ্কুরে পাখীর চোখ কান ও হৃদ্‌পিণ্ডেরও একটু আভাস দেখা যাইবে। হৃদ্‌পিণ্ড এই সময় হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া তালে তালে শিকড়ের মতো শিরায় রক্তের স্রোত চালাইতে আরম্ভ করে। পাখীদের শরীর ডিমের লালা দিয়াই তৈয়ারি হয়। তাই এ-সময়ে ডিমের ভিতরে লালার পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করে।

তিন দিনের পরে ডিমের অবস্থা

চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে পাখীর মাথা ও গলা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তখন কুসুমের গা হইতে ছোটো বাচ্চাটিকে পৃথক্ দেখা যায়,—কেবল একটা নলের মতো অংশ দিয়া তাহা কুসুমের সঙ্গে জোড়া থাকে।

সাত বা আট দিন পরে ডিমের ভিতরে পাখীর পা ডানা ও মাথা বেশ ভালো করিয়াই বুঝা যায়। তোমরা যদি এই সময়ের চেহারাটা দেখ, তবে তাহাকে পাখী বলিয়াই চিনিতে পারিবে। কিন্তু মাথাটা থাকে তখন প্রকাণ্ড। এই সময়ে বাচ্চার শরীরের নীচে হইতে একটা বড় থলির মতো অংশ বাহির হয়। ইহাই ডিমের ভিতরকার বাচ্চার নিশ্বাসের যন্ত্র। ডিমের খোলাটা নিরেট নয়,—খোলার গায়ে খুব ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে। সেই সকল ছিদ্র দিয়া ভিতরে বাতাস প্রবেশ করিতে থাকে এবং থলির গায়ের শিরার রক্ত সেই বাতাস হইতে অক্সিজেন চুষিতে আরম্ভ করে।

বারো-তেরো দিন তা' দেওয়ার পরে, ডিমের ভিতরকার সব লালাই পাখীর শরীর তৈয়ারি করিতে খরচ হইয়া যায়। তাই তখন আর ডিমে লালা দেখা যায় না, কিন্তু কুসুমটি থাকে। নিশ্বাস টানিবার যে থলিটার কথা আগে বলিয়াছি, তাহা এ-সময়ে খুব বড় হইয়া ডিমের প্রায় আধখানা জুড়িয়া ফেলে। ডিমের ভিতরকার বাচ্চা

যেমন বড় হইতে আরম্ভ করে, তেমনি বেশি নিশ্বাসের দরকার হয় বলিয়াই থলিটা বড় হয়।

কুড়ি-বাইশ দিনের পর ডিমের ভিতরকার বাচ্চার সকল অঙ্গই পুষ্ট হয়। তখন ঠোঁটও দেখা দেয়। এই সময়ে ডিমের ভিতরে লালা ও কুসুমের একটুও চিহ্ন থাকে না। যে একটু কুসুম পূর্ব্বে বাকি ছিল, তাহা বাচ্চারা শরীরের ভিতরে টানিয়া লয়।

ইহার পরেই ডিম-ফোটার সময় আসে। তখন বাচ্চারা ডিমের ভিতরে ছটফট্ আরম্ভ করে এবং তাজা বাতাসে নিশ্বাস লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তাই ঠোঁট্ দিয়া ডিমের সেই মোটা দিক্‌টার চামড়া ছিঁড়িয়া সেখানে যে বাতাস আবদ্ধ থাকে, তাহা দিয়া নিশ্বাসের কাজ চালাইতে থাকে। এই সময়ে হাঁস ও মুরগীর বাচ্চারা ডিমের মধ্যে থাকিয়া কখনো কখনো চিক্-চিক্ শব্দও করে। পাখীর বাচ্চারা কিচির-মিচির করিয়া ডাকে, ধাড়ী পাখীরা খুব চীৎকার করে, কিন্তু পাখীদের ডিমের ভিতরকার বাচ্চারা ডাকে ইহা অদ্ভুত কথা,—কিন্তু অদ্ভুত হইলেও ইহা সত্য। যাহা হউক, ভালো বাতাসে নিশ্বাস লইয়া ডিমের ভিতরকার বাচ্চাদের গায়ে যখন বেশ জোর হয়, তখন তাহারা আর খোলার ভিতর থাকিতে চায় না,—ঠোঁট দিয়া

খোলা ভাঙিয়া বাহিরে আসে। তার পরে হাঁস ও মুরগীর বাচ্চারা কি করে, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। জন্মের পরে হাঁসেরা মায়ের সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করে এবং মুরগীর বাচ্চারা চিক্-চিক্ শব্দ করিতে করিতে খাবারের সন্ধানে মায়ের পিছু পিছু বাহির হইয়া পড়ে।

ডিম প্রসবের পরে কত দিন তা' দিলে পাখীদের বাচ্চা বাহির হয়, তাহা তোমাদিগকে ঠিক্ বলিতে পারিব না। প্রত্যেক জাতের পাখীর তা'য়ে বসিয়া থাকার এক-একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। মুরগীদের একুশ দিনে ডিম ফুটিয়া যায়। পায়রারা চৌদ্দ পনেরো দিন ক্রমাগত ডিমে তা' দেয়; ইহার পরে ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাখীর ডিমে তা' দিবার সময়ও ভিন্ন।

তোমরা বোধ হয় মনে কর, কেবল স্ত্রী-পাখীরাই ডিমে তা' দেয়। কিন্তু তাহা নয়। অনেক পাখীরই স্ত্রী ও পুরুষ পালা করিয়া ডিমে তা' দেয়। এবারে যখন তোমাদের বাগানের গাছে বা বাড়ীর বারান্দার কড়িকাঠে শালিকেরা বাসা করিয়া ডিম পাড়িবে তখন লক্ষ্য করিয়ো; দেখিবে, স্ত্রী ও পুরুষ দুই পাখীই বাসায় আনাগোনা করিতেছে। স্ত্রী-শালিক চরিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেই পুরুষ-শালিক ডিমে তা' দিতে বসিয়া যায়।

উঠ-পাখীর কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় তোমরা এই পাখী দেখিতে পাইবে। ইহাদের পুরুষেরাই ডিমে তা' দেয়, স্ত্রী-পাখী ডিম প্রসব করিয়া ডিমের আর খোঁজ লয় না। দয়েল পাখীর স্ত্রী ও পুরুষ তুইয়ে মিলিয়াই তা' দেয়। কিন্তু হাঁসদের মধ্যে ইহা একবারেই দেখা যায় না,—স্ত্রী-হাঁসই ডিমে তা' দেয়।

বাচ্চা পাখী

ছাগল গরু ভেড়া প্রভৃতির বাচ্চা হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাচ্চারা পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ায় এবং মায়ের দুধ খাইয়া দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে লাফাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। কিন্তু বিড়াল বা কুকুরের ছানারা তাহা পারে না। জন্মের পরে ইহাদের চোখ খুলিয়া তাকাইবার শক্তি থাকে না এবং হাঁটিতেও পারে না। কয়েক দিন মায়ের দুধ খাইয়া যখন গায়ে বেশ বল হয়, তখন ইহারা চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে এবং চোখ্ খুলিয়া তাকাইতে পারে। পাখীদের মধ্যে সক্ষম ও অক্ষম দুই রকমেরই বাচ্চা হয়। হাঁস ডাহুক ও মুরগীর বাচ্চারা ডিম হইতে বাহির হইয়া কি-রকমে ছাগল-ছানাদের মতো চলাফেরা করে, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু এমন অনেক পাখী আছে, যাহাদের বাচ্চা বিড়াল-ছানার মতো কানা ও অক্ষম হইয়া জন্মে। শালিক, চড়াই, পায়রা, কাঠঠোকরা, কোকিল,

প্যাঁচা, মাছরাঙা প্রভৃতি অনেক পাখীর বাচ্চাতেই তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। যখন ডিম হইতে বাহির হয়, তখন ইহাদের চোখ বোঁজা থাকে, গায়ে

চড়াইয়ের বাচ্চা

বেশি পালকও থাকে না। বাচ্চাদের বাপ-মা বহু কষ্টে পোকা-মাকড় সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে খাওয়ায় এবং উড়িতে শিখায়। এই-রকম যত্ন না পাইলে এই-সব পাখী ছোটো বেলাতেই মারা যায়।

তাহা হইলে দেখ, সন্তানের উপর পাখীদের মায়া-মমতা বড় অল্প নয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে শালিকদের বাচ্চা হয়। এই সময়ে তাহারা ছানাগুলিকে লইয়া যে-রকম ব্যস্ত থাকে, তাহা তোমরা একবার দেখিয়ো। তখন সমস্ত দিন তাহারা একটুও বিশ্রাম করিবার সময় পায় না। বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া তাহারা কখনো ফড়িং, কখনো-বা কিল্-

বিলে সবুজ পোকা ঠোঁটে লইয়া বাচ্চাদের খাওয়ায়। বাচ্চারাও তেমনি,—এত পোকা খাইয়া তাহাদের ক্ষুধা ভাঙে না। মাকে দেখিয়াই তাহারা খাবারের জন্য প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া চিঁ-চিঁ শব্দ করিতে থাকে। ছোটো ছানাগুলা যেন এক-একটা রাক্ষস! কিছুতেই ক্ষুধা ভাঙিতে চায় না। কোকিল ও কাকের বাচ্চারা খাবারের জন্য তাহাদের মাকে কি-রকম জ্বালাতন করে তোমরা দেখ নাই কি? খাবারের জন্য তাহারা সমস্ত দিন আকাশ পাতাল হাঁ করিয়া ভয়ানক চীৎকার করে; ইহাদের পেটের জ্বালা যেন কিছুতেই থামিতে চায় না।

পায়রা ও ঘুঘুরা কি-রকমে ছোটো বাচ্চাদের খাওয়ায় তাহা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। ইহারা গলার নীচেকার থলি হইতে দুধের মতো এক-রকম জিনিস উগ্‌রাইয়া ছানাদের খাওয়ায়। এই দুধ খাইয়াই তাহারা বড় হয়। বক ও পানকৌড়িদের মাছই প্রধান আহার। উহাদের ছানারাও ছোটো-বেলা হইতেই মাছ খাইতে চায়। তাই ধাড়ী পাখীরা ছোটো মাছ ধরিয়া ছানাদের জন্য গলার থলিতে রাখিয়া দেয়। তার পরে বাসায় আসিয়া সে-গুলি উগ্‌রাইয়া বাচ্চাদের পেট ভরায়।

যাহা হউক, পাখীদের ছানারা কিন্তু ভয়ানক পেটুক। তোমাদের খোকা-খুকীকে দুধ খাওয়াইতে কত হাঙ্গামা করিতে হয়, তোমরা তাহা সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু ছানাদের খাওয়াইতে পাখীর মা-দিগকে একটুও কষ্ট পাইতে হয় না; মুখের কাছে খাবার ধরিলেই তাহারা কপ্ করিয়া সব খাইয়া ফেলে এবং আরো খাইবার জন্য চীৎকার আরম্ভ করে।

পাখীদের বাসা

তোমরা বোধ হয় ভাবো, আমরা যেমন বারো মাসই ঘরের ভিতরে বাস করি, পাখীরাও বুঝি বাসা তৈয়ারি করিয়া তাহাতে বারো মাস থাকে। কিন্তু তাহা নয়,—কেবল ডিম পাড়িবার জন্য এবং বাচ্চাদের পালন করিবার জন্যই তাহারা বাসা তৈয়ারি করে। আমাদের দেশের অনেক পাখীই চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। তাই ঐ-সময়ে বাসা বাঁধিবার জন্য উহাদের ধূম পড়িয়া যায়। তোমরা যদি ঐ-সময়ে বাড়ীর কাছের বাগানে বেড়াইতে যাও, তবে দেখিবে, শালিক, চড়াই, কাক ও ফিঙেদের মধ্যে ভয়ানক সোরগোল লাগিয়া গিয়াছে। কেহ খড়ের কুটো, কেহ ন্যাকড়ার ফালি, কেহ শুক্‌না সরু ডাল ঠোঁটে লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কাকেরা আবার লম্বা লম্বা কঞ্চি মুখে করিয়া গাছের উপরে বাসা বানাইতে যায়। কত বার ঠোঁট্ হইতে কঞ্চি খসিয়া মাটিতে পড়ে, কিন্তু তাহাতে উহারা একটুও বিরক্ত হয় না; বার-বার সে-গুলিকে খুঁটিয়া লইয়া

গাছের মাথায় গিয়া হাজির হয়। বৈশাখ মাসের বিকালে এক-একদিন যে কি-রকম ঝড় হয় তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এই ঝড়ে অনেক পাখীরই বাসা ভাঙিয়া ও উড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাতে তাহারা একটুও বিরক্ত হয় না। ভোর হইলেই নূতন করিয়া বাসা বাঁধিতে লাগিয়া যায়।

কিন্তু বাসা-তৈয়ারির এত যত্ন সারা বৎসর ধরিয়া চলে না। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলে এবং ছানাগুলি বড় হইলে পাখীরা আর বাসার খবর লয় না। তখন তাহারা দিনের বেলায় মাঠে-ঘাটে চরিয়া বেড়ায় এবং সন্ধ্যা হইলে কেহ গাছের ডালে কেহ-বা ঝোপে-জঙ্গলে থাকিয়া রাত কাটায়। আমাদের বাগানে একটা বকুল গাছে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে যে কত কাক, কোকিল, শালিক আশ্রয় লয়, তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না। তখন শালিকেরা কি ভয়ানকই চীৎকার করে! বোধ করি, কে আগার ডালে এবং কে নীচের ডালে বসিবে, তাহা লইয়া উহাদের মধ্যে ঘোর তর্ক বাধে এবং শেষে এক দল আর এক দলকে গালাগাল দেয়। কিন্তু কাকেরা বেশি চেঁচামেচি করে না। আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এই-রকম এক-একটা গাছ রাত্রি কাটাইবার জন্য পাখীরা ঠিক্ রাখে। তোমাদের গ্রামে

এ-রকম গাছ নাই কি ? খোঁজ করিয়ো, দেখিবে, গ্রামের বাহিরে পুকুরের ধারে কোনো তেঁতুল গাছে হয় ত গ্রামের পাখীরা আড্ডা করে।

তাহা হইলে দেখ, শীত ও বর্ষাকালে আরামে থাকিবার জন্য আমরা যেমন ঘর-বাড়ী তৈয়ারি করি, পাখীরা সে-জন্য বাসা তৈয়ারি করে না। বৃষ্টিতে ভিজিলে বা রোদে পুড়িলে ইহাদের অসুখ করে না। ডিম পাড়িবার, এবং বাচ্চাদের পালন করিবার জন্যই পাখীরা কয়েক মাসের জন্য বাসা বাঁধে।

কাক বক ও শালিক

কাকের বাসা তোমরা দেখিয়াছ কি? দুষ্টামিতে কাকই সব পাখীর সেরা। কিন্তু উহারা যে বাসা তৈয়ারি করে, তাহা দেখিলে কাকের মাথায় যে একটুও বুদ্ধি আছে, তাহা মনে হয় না। শুক্‌না সরু ডাল, খড়, কাগজের টুক্‌রো, কত-কি ছাঁইভস্ম যে তাহারা বাসার জন্য গাছের মাথায় জড় করে, তার ঠিক্‌ই হয় না। কখনো কখনো টিনের টুক্‌রো, লোহার তারও কাকদের বাসায় পাওয়া যায়। একখানা বইতে পড়িয়াছিলাম, একটা দুষ্ট কাঁক এক চশমা-ওয়ালার দোকান হইতে চশমার সোনার ফ্রেম চুরি করিয়া নিজের বাসা সাজাইয়াছিল। চশমা-ওয়ালা রোজই দেখে দুই-চারিখানা করিয়া ফ্রেম হারাইয়া যাইতেছে। সে পুলিশে খবর দিল, চাকর ও দারোয়ানদের ধমক দিতে লাগিল, কিন্তু কে ফ্রেম চুরি করিতেছে ধরা গেল না। শেষে একদিন কাকের মুখে চশমার ফ্রেম দেখিয়া চোর ধরা পড়িয়া গেল। একটা ঝাউ গাছের মাথায় কাকটা যে বাসা

করিয়াছিল, তাহাতে সব চশমার ফ্রেমই পাওয়া গিয়াছিল। দেখ, কাকেরা কি ভয়ানক দুষ্ট। যাহা হউক যে-সব ছাই-ভস্ম বাসা বাঁধিবার জন্য কাকেরা জড় করে, সেগুলিকে যদি তাহারা পরিপাটি করিয়া বাসায় সাজায় তবে বাসাটা দেখিবার মতো হয়। কিন্তু কাকেরা তাহা করিতে জানে না। এলোমেলো-ভাবে ঐ-সব কুটাকাটা গাছের ডালে আট্‌কাইয়া তাহারা কোনোগতিকে মাথা গুঁজিবার জায়গা করিয়া লয়।

অনেক পাখীরই স্ত্রী ও পুরুষ এক সঙ্গে মিলিয়া বাসা তৈয়ারি করে। কিন্তু কাকদের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। ইহাদের স্ত্রী খাটিয়া মরে, আর পুরুষটা বাসার কাছে বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ঠোঁট্ ঘুরাইয়া স্ত্রীর কারিগুরির তারিফ করিতে থাকে। কিন্তু বাসায় ডিম পাড়া হইলে পুরুষ কাকেরা আর ফাঁকি দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তখন তাহাদিগকে বাসার কাছে থাকিয়া ডিমের পাহারা দিতে হয়। কাকদের মতো চোর ও গুণ্ডা পাখী বোধ করি আর নাই। সুবিধা পাইলেই ইহারা অন্য পাখীর বাসায় গিয়া সেখানকার ডিম ও বাচ্চা চুরি করিয়া খাইয়া ফেলে। তাই শালিক, ফিঙে, প্যাঁচা, চিল, চড়াই, পায়রা, ঘুঘু, সব পাখীই কাকদের উপরে হাড়ে চটা। যার শত্রু অনেক তাহাকে সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়। এই

জন্যই বাসায় ডিম পাড়িয়া কাকেরা এক দণ্ড নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

তোমাদের বাড়ীর আঙিনায় ভোর হইলেই যে-সব শালিক চরিতে আসে, তাহাদের বাসা হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। বৈশাখ মাস হইতে ইহারা বাসা বাঁধিবার জোগাড় করে। চেষ্টা করিলে তোমাদের বাড়ীর বারান্দায় কড়িকাঠের ফাঁকেই হয় ত দুই-একটা শালিকের বাসা দেখিতে পাইবে। গাছের ফোকরেও ইহারা বাসা করে। কিন্তু বাসাগুলিতে একটুও কারিগুরি দেখা যায় না। খড়কুটা, সাপের খোলস, ময়লা নেকড়া-কানি যাহা সম্মুখে পায় সবই কুড়াইয়া আনিয়া ইহারা সেগুলির উপরে একটু বসিবার মতো জায়গা করিয়া লয়। ইহাই শালিকের বাসা। এই বাসাতেই শালিকেরা তিন-চারিটি করিয়া নীল রঙের ডিম পাড়ে।

তোমরা গাং-শালিকের বাসা দেখিয়াছ কি? ইহারা গৃহস্থের বাড়ীতে বা গ্রামের মধ্যে চরিতে আসে না,—নদীর ধার ও খোলা মাঠ ইহারা বেশি পছন্দ করে। আমরা ছেলেবেলায় যখন নৌকা করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতাম, তখন নদীর উঁচু পাড়ের গায়ে গাং-শালিকের বাসা দেখিতে পাইতাম। ইহাদের বাসা লতা-পাতা বা খড়কুটা দিয়া তৈয়ারি নয়;—নদীর ভাঙনের গায়ে

যে-সব গর্ত্ত থাকে তাহাই উহাদের বাসা। অনেকে বলে গাং-শালিকেরা ইঁদুরের গর্ত্তে বাসা করে। কিন্তু তাহা নয়। ঠোঁট্ ও নখ দিয়া মাটি সরাইয়া ইহারা গর্ত্ত করে এবং তাহারি ভিতরে দুই চারিটি খড় বা কাটাকুটা বিছাইয়া ডিম পাড়ে। এইবারে তোমরা যখন নৌকা করিয়া বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নদীতে বেড়াইতে যাইবে তখন নদীর পাড়ের গায়ে গাং-শালিকের বাসা দেখিয়ো। এক এক জায়গায় ইহাদের বাসার অনেক গর্ত্ত দেখা যায়।

গো-শালিকেরাও জ্যৈষ্ঠমাসে বাসা বাঁধে। কিন্তু ইহাদের বাসা তোমরা কখনই বাড়ীর বারান্দায় বা দেওয়ালের গর্ত্তে দেখিতে পাইবে না। ছোটো-বড় যে কোনো গাছে খড়, নেকড়া-কানি এবং কুটাকাটা দিয়া ইহারা ভারি বিশ্রী বাসা বানায়। ইহারা যেমন দল বাঁধিয়া গ্রামের বাহিরে চরিয়া বেড়ায়, তেমনি বাসা বাঁধিবার সময়ে দল বাঁধিয়া বাসা বাঁধে। তাই একই ছোটো গাছে, গো-শালিকদের দুই তিনটা বাসা দেখা যায়। বাসাগুলি এমন বিশ্রী যে, দূর হইতে সে-গুলিকে দেখিলে মনে হয় যেন, একরাশ খড় ঝড়ে উড়িয়া গাছের উপরে আট্‌কাইয়া আছে। যাহা হউক, ইহারি মধ্যে গো-শালিকেরা ডিম পাড়ে এবং তাহাদের বাচ্চাদের কিছুদিনের জন্য পালন করে।

বকেরা সন্ধ্যার সময়ে গ্রামের বাহিরে তেঁতুল বা অশথ গাছে আসিয়া সেখানেই রাত্রি কাটাইয়া দেয়। সমস্ত বৎসরই তাহাদের এইরকমে কাটে। কিন্তু বর্ষাকাল আসিলে তাহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, তখন বাসা বাঁধিবার জন্য আয়োজন করিতে হয়। কোঁচ্ বকেরা কখনই দল বাঁধিয়া চরিতে বাহির হয় না। ইহারা একা-একাই পুকুরের ধারে বেড়াইয়া মাছ ও পোকা-মাকড় খায়। কিন্তু বাসা বাঁধিবার সময়ে তাহারা এক গাছে একা বাসা বাঁধে না। তোমরা গ্রামের বাহিরে খোঁজ করিলে একই গাছে চারি-পাঁচটা বকের বাসা দেখিতে পাইবে। ডিম ও বাচ্চা হইলে বকেরা বাসায় বসিয়া কোঁক্-কোঁক্ শব্দ করে। ইহা শুনিয়া খোঁজ করিলে বকেদের বাসা বাহির করা যায়। বকেরা কাকেদের মতোই কাটাকুটা দিয়া বাসা তৈয়ারি করে। বাসায় একটুও শ্রী-ছাঁদ দেখা যায় না।

ফিঙে ও হল্‌দে পাখী

ফিঙে পাখী তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহারা গাছের আগ্‌ডালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রেলে করিয়া যাইবার সময়ে টেলিগ্রাফের তারের উপরে অনেক ফিঙাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহারা মোটেই ভালোমানুষ নয়। দুষ্টামিতে কখনো কখনো ইহারা কাকদেরও হারাইয়া দেয়। ফিঙের বাসা তোমরা হয় ত দেখ নাই। গাছের শুক্‌না শিকড়ের মতো নানারকম জিনিস দিয়া ইহারা পেয়ালার মতো এক-একটা বাসা তৈয়ারি করে। পাছে বাসার ঘাসগুলি এলোমেলো হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, এইজন্য ইহারা মাকড়সার জাল ঠোঁটে করিয়া আনিয়া, তাহার চারিদিকে জড়াইয়া রাখে। ফিঙেদের লেজ কত লম্বা তাহা তোমরা দেখিয়াছ। যখন তাহারা ডিমে তা দিতে বসে, তখন সেই লম্বা লেজ বাসার বাহিরে থাকিয়া যায়! অত বড় লম্বা লেজের জায়গা বাসায় হয় না। ফিঙেরা

বড়ই ঝগড়াটে পাখী। চিল, শিকরা ও কাকদের ইহারা দুইচোখে দেখিতে পারে না। বাছুর হইলে দুই-একটা গরু কি-রকম দুষ্ট হয়, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। তখন সে মানুষ দেখিলেই ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া মারিতে যায়। বোধ হয় ভাবে, পৃথিবীর সব লোকেই তাহার বাছুরটিকে কাড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ডিম পাড়িলে ফিঙেদের মেজাজ ঠিক ঐ-রকমই হয়। তখন তাহারা অন্য পাখীকে বাসার কাছে ঘেঁসিতে দেয় না। যদি কোনো পাখী ভুল করিয়া বাসার কাছে ডালে আসিয়া বসে, তবে ফিঙেরা বাসা হইতে বাহির হইয়া তাহাকে ঠোক্‌রাইয়া দূরে তাড়াইয়া দেয়।

তাই বলিয়া ফিঙেদের যে অন্য কোনো বন্ধুবান্ধব একেবারেই নাই ইহা বলা যায় না। হল্‌দে পাখীদের সঙ্গে ফিঙেদের বড়ই ভাব। তাই যে-গাছে ফিঙেরা বাসা বাঁধে সে-গাছে হল্‌দে পাখীর বাসা দেখা যায়। ফিঙেরা হল্‌দে পাখীদের উপর কোনো অত্যাচার করে না। দারোগার বাড়ীর কাছে গৃহস্থের বাড়ী থাকিলে গৃহস্থের আর চোর-ডাকাতের ভয় থাকে না। সত্যই ফিঙেরা পুলিশ-দারোগার মতোই জবরদস্ত পাখী; তাই হল্‌দে পাখীরা তাহাদের আশ্রয়ে বেশ নিশ্চিন্ত থাকে। পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা ফিঙে পাখীকে কি বলে তোমরা বোধ

হয় তাহা জানো না। তাহারা ফিঙেকে কোতওয়াল অর্থাৎ দারোগাপাখী বলে। বাস্তবিকই দারোগার কাছে চোর-ডাকাত যেমন জব্দ থাকে, ফিঙেদের কাছে অন্য পাখী দিগকে সেইরকম শিষ্টশান্ত থাকিতে দেখা যায়।

হল্‌দে পাখীগুলিকে দেখিতে যেমন সুন্দর তাহাদের বাসাগুলিও তেমনি সুন্দর। নেয়ারের খাট তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। চওড়া ফিতা দিয়া এই খাট ছাওয়া হয়। তাই ইহাতে শুইতে বেশ আরাম লাগে। হল্‌দে পাখীরা গাছের চওড়া ছাল দুই ডালে আট্‌কাইয়া তাহার উপরে বাসা বানায়। বাসাগুলি যেন এক-একটা দোল্‌না। বোধ হয় এইরকম বাসায় থাকিয়া তাহারা বেশ আনন্দ পায়। কাক-শালিকের বাসার মতো তাহাতে একটুও আবর্জ্জনা থাকে না। শুক্‌না ঘাস ও সরু শিকড় ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া ইহারা বাসাগুলিকে এমন সুন্দর রাখে যে, দেখিলেই যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। হল্‌দে পাখীরা ফিঙেদের মতোই পেয়ালার আকারের বাসা বাঁধে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পাখীই বাসা বাঁধিবার সময়ে ভয়ানক পরিশ্রম করে, কিন্তু ডিমে তা' দেয় কেবল স্ত্রীরা। তোমরা সুবিধা পাইলে হল্‌দে পাখীর বাসা খোঁজ করিয়া পরীক্ষা করিয়ো।

কোকিলের দুষ্টামি

কাক ও কোকিলের মধ্যে যে কেন এত শত্রুতা তা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে যেন দা-কুমড়ার সম্বন্ধ,—কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না। কাক খুব দুষ্ট, কিন্তু এক এক সময়ে দুষ্টামি বুদ্ধিতে কোকিল কাকদেরও হারাইয়া দেয়।

কোকিলেরা জন্মেও বাসা বাঁধে না, বোধ করি বাসা বাঁধিতে জানেও না। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে কত পাখী কত রকমের বাসা বাঁধে কিন্তু তোমরা কখনো কোকিলকে খড়কুটো মুখে করিয়া বাসা বাঁধিবার জন্য উড়িতে দেখিয়াছ কি? আমরা কিন্তু কখনো দেখি নাই। তখন তাহারা দিবারাত্রিই গাছের ডালে বসিয়া কুউ-কুউ গান করিয়াই কাটাইয়া দেয়। ক্ষুধা লাগিলে দুইচারিটা পোকামাকড় বা পাকা বটের ফল খাইয়া খুসী থাকে। তার পরে ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী-কোকিলেরা লুকাইয়া কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া আসে।

কাকেরা নিজেদেরই ডিম মনে করিয়া সেগুলিকে খুব যত্ন করিয়া তা দেয় এবং বাচ্চা বাহির হইলে বাচ্চাদের যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া বড় করে। তাহারা যে পরের বাচ্চা পালন করিতেছে, তাহা একেবারেই বুঝিতে পারে না। তার পরে একদিন যখন তাহারা সেগুলিকে কোকিল বলিয়া চিনিতে পারে, তখন তাহাদিগকে দূর দূর করিয়া বাসা হইতে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে কোকিলের বাচ্চাদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তখন তাহারা উড়িতে শিখে, আপনাদের খাবার আপনারা জোগাড় করিতে পারে। বোধ করি, কোকিলেরা কাকদের সঙ্গে এই রকম চালাকি করে বলিয়া কাকেরা কোকিলের উপরে চটা।

কোকিলেরা যে-রকমে কাকের বাসায় ডিম পাড়ে তাহা বড় মজার। তোমরা বোধ হয় জানো, আমরা যে-সব চক্‌চকে কালো কোকিল দেখিতে পাই, তাহাদের সকলেই পুরুষ-কোকিল এবং যাহাদের আমরা তিলে কোকিল বলি, তাহারাই স্ত্রীকোকিল। স্ত্রী-কোকিলেরা বড় লাজুক। যখন কালো পুরুষ-কোকিলেরা কু-উ—কু-উ শব্দে গান জুড়িয়া দেয় তখন তিলে স্ত্রী-কোকিলেরা পাতার আড়ালে লুকাইয়া দিন কাটায়। ইহাদের গলার স্বর থাকে না, দেহে রূপও থাকে না।

ভাঙাগলায় তাহারা একপ্রকার যে শব্দ করে তাহাতে যেন কান ঝালাপালা হয়। যাহা হউক ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রীকোকিল পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকে, পুরুষ-কোকিল তখন কাকের বাসার কাছে ডালে বসিয়া কু-উ, কু-উ করিয়া গান জুড়িয়া দেয়। কাকেরা কি-রকম অদ্ভুত পাখী তাহা তোমরা জানো। পৃথিবীর কোনো জিনিসকেই তাহারা ভালো মনে করে না। ধপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইলে বা দু'জন লোক দৌড়াইয়া চলিলে বা উঁচুগলায় চীৎকার করিলে তাহাদের মনে সন্দেহ হয়; আর কা-কা করিয়া আরো দশটা কাককে ডাকিয়া একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয়।

তাই নিজের বাসার কাছেই কোকিলের গান শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারে না; বাসার বাহিরে আসিয়াই কা-কা করিয়া কোকিলকে তাড়া করে। কিন্তু কোকিল চালাক পাখী—কাকের তাড়াতে ভোলে না। কিক্-কিক্ কুক্-কুক্ শব্দ করিতে করিতে সে আগে আগে উড়িয়া চলে, এবং কাক পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকে। এইরকমে কাক যখন বাসা ছাড়িয়া দূরে থাকে, তখন স্ত্রী-কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া চট্ করিয়া পালাইয়া যায়। কেবল ইহাই নয়, যদি বাসায় ডিম পাড়িবার জায়গা না থাকে, তবে স্ত্রী-কোকিলেরা দুই

চারিটা কাকের ডিম মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই খালি জায়গায় ডিম পাড়ে। দেখ, কোকিলেরা কত দুষ্ট! কাকেরা মনে মনে ভাবে তাহারাই পাখীদের মধ্যে বুদ্ধিমান্। কিন্তু কোকিলদের কাছে সময়ে সময়ে তাহাদের হার মানিতে হয়।

বুল্-বুল দোয়েল্ খঞ্জন মাছরাঙা ও হাঁড়িচাঁচা

আমাদের দেশে অনেক জাতের বুল্-বুল্ আছে, কিন্তু তাহারা সকলে একই রকমে বাসা বাঁধে। বুল্-বুলের বাসা সন্ধান করিবার জন্য তোমাদের বেশি কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না; হয় ত বাগানের বেড়ার উপরে ইহা দেখিতে পাইবে। উঁচু গাছের উপরে বুল্-বুলেরা প্রায়ই বাসা করে না। ইহাদের বাসাগুলি খড়কুটা দিয়া তৈয়ারি এক একটা পেয়ালার আকারের। তাহাতেই ইহারা গোলাপির উপরে লালের দাগ-দেওয়া কয়েকটা ডিম পাড়ে। কিন্তু এই সব ডিম হইতে বাচ্চা হয় বড়ই কম। নীচু ঝোঁপে বাসা থাকে বলিয়া সাপ ও গিরগিটিরা প্রায়ই ডিমগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। গৃহস্থের বাড়ীর কাছে যে-সব বুল্-বুলে বাসা করে, তাহাদের ডিম বিড়ালে চুরি করিয়া খাইয়াছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। এই-রকমে ডিম বারবার নষ্ট হইলে তাহারা কিন্তু একটুও হতাশ হয় না। প্রতি বৎসর একই বুল্-বুল্ তিন চারবার ডিম

পাড়িয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ইহাদের পুরুষ-স্ত্রী দুইয়ে মিলিয়াই বাচ্চাদের যত্ন করে। পুরুষ-বুল্-বুল্ ঠোঁটে করিয়া ফড়িং ও পোকা-মাকড় ধরিয়া আনিয়া বাচ্চা-দের খাওয়াইতেছে, ইহা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি।

দোয়েল পাখী বোধ করি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। তাদের গলার স্বর অতি মিষ্ট। অন্য পাখীরা মানুষকে ভয় করে। কিন্তু ইহারা মানুষ দেখিলে ফস্ করিয়া পালায় না। বৈশাখ মাসে ঘরের জানালার ভিতর বা পাঁচিলের ফাটালে খড়কুটো বিছাইয়া ইহারা বাসা বানায়। কখনো কখনো গাছের কোটরেও ঐরকমে দোয়েলকে বাসা বানাইতে দেখা যায়।

খঞ্জনপাখীদের আকৃতি-প্রকৃতি কতকটা দোয়েলেরই মতো। কিন্তু ইহারা দোয়েলদের মতো ভালো গান করিতে পারে না। খঞ্জনের বাসা প্রায় পুকুরের ধারে গাছের কোটরে দেখা যায়। বোধ করি ইহারা স্যাঁতা জায়গার পোকা-মাকড় পছন্দ করে বলিয়াই জলের ধার ছাড়িতে চায় না।

চক্-দোয়েলপাখী তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহারাও সুন্দর গান করে। এই পাখীর ভুরু সাদা, রঙ্ ধোঁয়াটে রকমের। ফিঙেদের মতো উড়ন্ত পোকা ধরিতে ইহারা মজবুত। নাম চক্-দোয়েল হইলেও, ইহারা কিন্তু দোয়েল জাতীয় পাখী নয়। গাছের নীচু ডালে ইহারা

ছোটো পেয়ালার আকারের বাসা করে এবং মাকড়সার জাল জড়াইয়া খড়-কুটাগুলিকে শক্ত করিয়া রাখে। এই পাখীগুলি নিতান্ত ছোটো নয়। তাই ছোটো বাসায় বসিয়া যখন ডিমে তা' দেয়, তখন বাসা দেখা যায় না,— মনে হয় যেন তাহারা ডালের উপরে পা গুটাইয়া বসিয়া আছে। প্রতি বৎসর ইহাদিগকে গরমির সময়ে দু'বার তিনবার করিয়া ডিম পাড়িতে দেখা যায়।

"ফটিকজল" পাখীদের বাসা খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। যদি কখনো খোঁজ পাও দেখিবে, এগুলি চক্-দোয়েলের বাসার মতো সুন্দর ও সিম-সাম্। গায়ে মাকড়সার জাল লাগানো থাকে বলিয়া সেগুলিকে ঠিক যেন এক-একটি পেয়ালার মতো দেখায়।

মাছরাঙা পাখী তোমরা একটু খোঁজ করিলেই পুকুর বা বিলের ধারে দেখিতে পাইবে। আমাদের দেশে মোটামুটি তিন রকমের মাছরাঙা দেখা যায়। ইহাদের কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। তোমরা বোধ হয় ভাবো, মাছরাঙারা অন্য পাখীদের মতো গাছে বাসা করে—কিন্তু তাহা নয়। নদী বা পুকুরের ধারে লম্বা সুরঙ্গ খুঁড়িয়া ইহারা তাহাতেই ডিম পাড়ে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মাছরাঙাদের সুরঙ্গ গাং-শালিকের সুরঙ্গের মতো ছোটো। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এগুলি এক‌এক-সময়ে

পঞ্চাশ-ষাট-হাত পর্য্যন্ত মাটির তলায় যায়। কিন্তু সকল সময়ে অত বড় গর্ত্ত তাহারা নিজে বানাইতে পারে না। তাই কখনো-কখনো মেঠো ইঁদুরের গর্ত্তে ইহাদিগকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়। মাছরাঙার গর্ত্ত খুঁজিলে অনেক মাছের কাঁটা পাওয়া যায়। যেমন নিজেরা মাছ খায়, তেমনি বাচ্চাদেরও মাছ খাওয়ায়। মাছের কাঁটা বড় শক্ত জিনিষ। পাখীরাও সেগুলিকে সহজে হজম করিতে পারে না। তাই মাছ খাইয়া মাছরাঙারা কাঁটাগুলিকে উগ্‌রাইয়া ফেলে। এই কাঁটাই ইহাদের বাসার চারিদিকে ছড়ানো দেখা যায়।

লম্বা-লেজ হাঁড়িচাঁচাদের বাসা যদি তোমরা দেখিতে চাও, তবে বাগানের গাছের খুব উঁচু ডালে খোঁজ করিয়ো। ইহারা প্রায়ই গাছের উঁচু ডালে বাসা বাঁধে এবং সেগুলিকে কাকদের মতোই হাব্‌জা-গোব্‌জা জিনিস দিয়া তৈয়ারি করে। খুব উঁচুতে বাসা থাকে বলিয়া অন্য জন্তু-জানোয়ারেরা ইহাদের ডিম নষ্ট করিতে পারে না। হাঁড়িচাঁচাদের ঠোঁট্‌গুলি কি-রকম তোমরা দেখ নাই কি? —ঠিক্ যেন কাকের ঠোঁটের মতো জোরালো। তাই সব পাখীই হাঁড়িচাঁচাদের ভয় করিয়া চলে। এমন কি কাকেরাও তাহাদের বাসার কাছে যায় না।

ঘুঘু ও কুকো

আমরা আগে বলিয়াছি, ঘুঘুরা বারোমাসই ডিম পাড়ে। এ-জন্য ইহাদের বারোমাসই বাসার দরকার হয়। যেসব প্রাণী বারোমাসই বাসায় থাকে তাহারা প্রায়ই সেগুলিকে পাকা করিয়া তৈয়ারি করে। কিন্তু ঘুঘুরা বাসা তৈয়ারির দিকে একেবারে মন দেয় না। কতকগুলা খড়কুটা একত্র করিয়া কোনোমতে ডিম পাড়িবার মতো জায়গা করিতে পারিলেই তাহারা খুসী থাকে। ঘুঘুর বাসাতে একটুও শ্রী-ছাঁদ দেখা যায় না। ডিম পাড়িলে ঘুঘুদের মেজাজ ভয়ানক কড়া হয়। পাছে কেহ ডিম কাড়িয়া লয় এই ভয় সর্ব্বদাই তাহাদের মনে জাগে। তাই বাসার কাছ দিয়া একটা কাক বা শালিক উড়িয়া গেলে কোঁ-কোঁ শব্দ করিয়া খামকা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে,—এমন কি চিল বা শিকরাপাখীরাও ঘুঘুর হাত হইতে রক্ষা পায় না। ঘুঘুরা কাকদের তাড়াইতে গিয়া তাহাদের লেজের পালক ছিঁড়িয়া দিয়াছে ইহা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি।

কুকোপাখীদের বাসা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। নিরিবিলি ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্যেই ইহাদের আড্ডা। তাই সেই-রকম জায়গায় ঘন ঝোঁপের মধ্যে ইহারা বাসা বাঁধে। কুকোর বাসা কাক-শালিকের বাসার মতো উপর-খোলা নয়;—বাসা ছাদ দিয়া ঢাকা থাকে এবং ভিতরে যাইবার জন্য তাহাতে একটা দরজাও থাকে। দূর হইতে দেখিলে বাসাগুলি এক-একটি লতাপাতার পিণ্ড বলিয়াই মনে হয়।

ছাতারেরা যেমন লক্ষ্মীছাড়া বিশ্রী পাখী, ইহাদের বাসাগুলিও সেই রকম বিশ্রী। ছাতারের বাসাকে যদি খড়-কুটার ঢিপি বলা যায়, তাহা হইলে অন্যায় হয় না। নির্জ্জন ঝোঁপের মধ্যে মাটি হইতে এক বা দেড় হাত উঁচুতে ইহারা বাসা তৈয়ারি করে। খড়কুটাগুলি ইহারা এ-রকম এলোমেলো-ভাবে সাজায় যে, কখনো-কখনো দুই-একটা ডিম বাসার ছিদ্র দিয়া গলিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

কাকের বাসায় যেমন কোকিলেরা লুকাইয়া ডিম পাড়ে তেমনি ছাতারের বাসায় পাপিয়া পাখীরা ডিম পাড়ে—এই রকম কথা শুনা গিয়াছে। কিন্তু আমরা ইহা স্বচক্ষে দেখি নাই। পাপিয়ার ডিম ছাতারের ডিমের মতোই উজ্জ্বল নীল রঙের, কিন্তু একটু বড়। আবার

পাপিয়ার বাচ্চাগুলিকে হঠাৎ দেখিলে ছাতারের বাচ্চা বলিয়া ভুল হয়। তাই মনে হয়, কথাটা হয় ত মিথ্যা নয়। কিন্তু পাপিয়ার বাচ্চারা ভয়ানক রাক্ষুসে পাখী, ঠিক্ কোকিল ও কাকের বাচ্চাদের মতো তাহারা দিন-রাত্রি খাই-খাই করে। এই স্বভাব দেখিয়াও ছাতারেরা কেন যে পাপিয়ার বাচ্চাদের আপন ভাবিয়া পালন করে তাহা বুঝা যায় না।

চিল শকুন ও হাড়গিলা

তোমরা কত রকম শকুন দেখিয়াছ জানি না। আমরা কিন্তু বাংলাদেশে সচরাচর দুই রকমই শকুন দেখিয়াছি। আকাশের দিকে তাকাইলেই খুব উঁচুতে যে-সব শকুনকে উড়িতে দেখা যায়, সেগুলির পিঠ সাদা, ইহারাই সাধারণ শকুন। আর যে এক রকম শকুন আছে তাহাদের দূর হইতে কালো দেখায় কিন্তু তাহাদের নেড়া মাথাগুলি লাল। যখন গো-ভাগাড়ে বসিয়া থাকে তখন ইহাদের গায়ের দুর্গন্ধে ত্রিসীমানায় যাওয়া যায় না। এই সব শকুনের বাসা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। গাছের খুব উঁচু ডালে ইহারা ডালপালা দিয়া প্রায়ই শীতকালে বাসা তৈয়ারি করে। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, কাক-শালিকের মতো ইহারা গাছের তলা হইতে শুকনা ডাল কুড়াইয়া আনে। কিন্তু ইহারা তাহা করে না। সেই বাঁকানো এবং চেপ্‌টা ঠোঁট দিয়া ইহারা পাতাশুদ্ধ গাছের কাঁচা ডাল ভাঙিয়া বাসা তৈয়ারি করে। যখন শকুনেরা ডানা মেলিয়া গাছের ডাল ভাঙে, তখন তাহাদের চেহারা-

গুলি দেখিলে হাসি পায়। এই সময় শকুনদের মেজাজও ভয়ানক চটারকমের হয়। ইহারা প্রায়ই পরস্পর মারামারি কামড়াকামড়ি করে না; কিন্তু ডিমপাড়ার সময় হইলে প্রায় বিশ্রী স্বরে চেঁচামেচি সুরু করিয়া দেয়। তোমাদের বাড়ীর কাছে তালগাছে যদি শকুনের আড্ডা থাকে, তাহা হইলে ডিমপাড়ার সময় ইহাদের চীৎকার শুনিতে পাইবে। শকুনেরা একটার বেশি ডিম পাড়ে না, কিন্তু সেই একটাতেই বাচ্চা হয়। অন্য পাখীরা ভয়ে শকুনের বাসায় উৎপাত করে না। উহাদের নোংরামি ও গায়ের দুর্গন্ধের জন্য মানুষও বাসার কাছে ঘেঁসে না। তাই শকুনদের ডিম প্রায়ই নষ্ট হয় না। তোমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে, যে-সব পাখীর ডিম বেশি নষ্ট হয়, তাহারাই কেবল বেশি ডিম পাড়ে।

চিল ও শকুন মরা জন্তুদের মাংস খাইলেও, উহারা একজাতির পাখী নয়। চিলেরা শকুনের চেয়ে অনেক ভদ্র। মরা গরু বা ঘোড়ার পেটের মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া ইহারা কখন পচা মাংস খায় না। চিলেরা বৎসরে দুই বার করিয়া ডিম পাড়ে। এইজন্য বর্ষার শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বাসার তদ্বির করিতে হয়। বাসাগুলিতে গাছের শুকনো ছোট

ডাল এবং খড় ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু সেগুলি চিলেরা বেশ ভালোরকম করিয়া বাসায় সাজাইতে পারে না ; একটু ঝড় হইলেই বাসাগুলি ভাঙ্গিয়া যায়। তাই প্রায়ই ঝড়ের পর দিনে চিলেরা গাছতলা হইতে শুকনা ডাল কুড়াইয়া বাসা মেরামতে লাগিয়া যায়। চিলের ডিমগুলি বড় সুন্দর। ইহাদের ডিমে ফিকে সাদার উপরে খয়েরি রঙের ছোপ থাকে।

চড়াইয়ের বাসা

চড়াই ছোট্টো পাখী হইলেও, ইহারা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বাসা বাঁধিবার সময় বড় জ্বালাতন করে। ইহারা গাছের ডালে বাসা করে না। দেশের খড়-কুটা ঠোঁটে লইয়া ঘরের কড়ি-কাঠের ফাঁকে বা কার্ণিসে জমা করে। কিন্তু যাহা কষ্ট করিয়া বাছিয়া আনে তাহার প্রায় সবই মেজের উপরে পড়িয়া যায়। তাই দিনে তিনবার করিয়া ঝাঁট্ না দিলে ঘর পরিষ্কার রাখা যায় না। তাড়া দিলেও চড়াইদের দূর করা যায় না। যদি চুপ-চাপ করিয়া এক-মনে বাসা বাঁধে তবে কোনো হাঙ্গামা থাকে না। কিন্তু চড়াইরা কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। একগাছি খড় মুখে করিয়া আনিয়াই স্ত্রী-পুরুষে ভয়ানক চর্-চর্-চর্ চীৎকার করিতে করিতে বাসার চারিদিকে লাফাইতে আরম্ভ করে। এত লাফানি, এত আনন্দ যে কেন তাহা বুঝিতে পারি না। তার পরে এক ঘরে যদি দুই জোড়া চড়াই, দুইটা বাসা করিতে লাগে তাহা হইলে সর্ব্বনাশ! দিনের মধ্যে দশবার দুই দলে ঝগড়া

বাধাইয়া দেয়। কোনো দলই হার মানতে চায় না,—শেষে ঝগড়ার সময় দুইটা চড়াই পায়ে পা বাধাইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করে। তোমরা চড়াইদের এই কাণ্ড দেখ নাই কি? চড়াইরা হিংসুটেও কম নয়। যে-ঘরে একজোড়া চড়াই বাসা করিয়াছে, সেখানে পায়রা; শালিক বা অন্য কোনো পাখী বাসা করিতে পারে না। ঘরে অন্য পাখী উঁকি মারিলেই চড়াইরা চড়্-চড়্ কড়্-কড়্ শব্দে লাফাইতে লাফাইতে এমন গালাগালি জুড়িয়া দেয় যে, সেখানে আর কেহই আসে না।

বাবুই টুন্‌টুনি ধনেশ কাঠ্‌ঠোকরা ও প্যাঁচা

একে একে অনেক পাখীর বাসার কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এখন যে-সব পাখী বাসা তৈয়ারিতে খুব কারিকুরি দেখায় তাহাদের কথা বলিব।

বাবুয়ের বাসা তোমরা দেখ নাই কি? আমাদের দেশের তাল, খেজুর এবং কখনো কখনো বাব্‌লাগাছে ইহা দেখিতে পাইবে। ঘাসের তৈয়ারি ছোটো ছোটো কুঁজোর মতো ঐ বাসা এক-একটা গাছে অনেকগুলি করিয়া ঝুলিতে দেখা যায়। আমরা একটা তাল গাছে একবার পঁচিশটা বাসা দেখিয়াছিলাম। বাবুইরা স্ত্রী-পুরুষ দুইয়ে মিলিয়া বাসা তৈয়ারি করে।

যে-রকমে বাবুইরা বাসা তৈয়ারি করে তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে। যে-সব খড়কুটা পথে-ঘাটে পড়িয়া থাকে তাহা দিয়া ইহারা বাসা তৈয়ারি

করে না। বাসার জন্য তাহাদের সূতার মতো ঘাস বা খড়ের ফালির দরকার হয়। তাই বনে-জঙ্গলে গিয়া লম্বা খড় ঠোঁট দিয়া সরু করিয়া চিরিয়া আনে এবং তাহার পরে সে-গুলিকে গাছের ডালে শক্ত করিয়া বাঁধে। ইহাই হয় তাহাদের বাসা ঝুলাইবার দড়ি। যাহাতে বাসা ছিঁড়িয়া ধপাস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া না যায়, তা'র জন্য তিন-চারি খেই খড় দিয়া তাহারা এই দড়ি তৈয়ারি করে। তারপরে স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া সেই-রকম খড় দিয়া ধীরে ধীরে বাসা বানায়। প্রথমে এই বাসার আকৃতি হয় একটা ঘণ্টা বা ছাতার মতো। বর্ষার আগে বাবুয়েরা বাসা তৈয়ারি স্বরু করে। তোমরা খোঁজ করিলে দড়িতে ঝুলানো ঘণ্টার আকারের বাসা হয়ত অনেক দেখিতে পাইবে। ঘণ্টার নীচে একটা দড়ি পাখীর দাঁড়ের মতো এধার হইতে ওধার পর্যন্ত লাগানো থাকে। বাবুইরা কাজ করিতে করিতে সেই ছাতার তলায় ঐ দড়ির উপরে বসিয়া বিশ্রাম করে এবং গান গাইয়া আনন্দ করে। লোকে বলে, ইহা বাবুইদের বৈঠকখানা,—স্ত্রী-বাবুই যখন খুব মন দিয়া বাসা বোনে, তখন পুরুষটি ঐ ছাতার তলাকার দাঁড়ে বসিয়া তাহাকে গান শুনাইয়া খুসি রাখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। বাবুয়ের বাসার নীচেকার

দাঁড়ের আকারের ঐ দড়িগাছটিকে বাসার ভিতরকার দেওয়ালের ভিত বলা যাইতে পারে। ঐ দড়িকে অবলম্বন করিয়া বাবুইরা বাসার ভিতরে কাম্‌রা তৈয়ারি করে। বাবুইরা বড় স্ফূর্ত্তিবাজ পাখী, বাসার কাজ অগ্রসর হইলে তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। তখন তাহারা যে কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া আকাশে অনাবশ্যক ডিগ্‌বাজি খাইয়া উৎসাহের চোটে অন্য পাখীর সঙ্গে মারামারিও করে। বোধ করি তাহারা তখন অন্য পাখীদের জানাইতে চায়—"দেখ্, আমরা কেমন বাসা বেঁধেচি, তোরা বোকা বাসা বাঁধ্‌তে জানিস্ না।"

বাবুয়ের বাসা গাছের ডালে দোল্‌নার মত সর্ব্বদাই দুলিতে থাকে। তাই বাবুইরা উড়িতে উড়িতে সরুপথ দিয়া বাসার ভিতর আনাগোনা করে; অন্য পাখী যে বাসার ভিতর গিয়া ডিম নষ্ট করিবে তাহার একটুও উপায় থাকে না। তোমরা একটা বাবুয়ের বাসা জোগাড় করিয়া পরীক্ষা করিয়ো; দেখিবে, উহার ভিতরে ডিমে তা' দিবার যে জায়গাটি আছে তাহা বড় সুন্দর। আমরা যেমন সন্ধ্যার সময়ে ঘরে প্রদীপ জ্বালি, বাবুইরা নাকি জোনাকিপোকা বাসায় লাগাইয়া সেই-রকমে বাসাগুলিকে আলোকিত করে, এইরকম একটা কথা

শুনিতে পাওয়া যায়। তোমরা ইহা শুনিয়াছ কি? কিন্তু আমরা বাবুয়ের বাসায় জোনাকি-পোকা দেখি নাই। তাই মনে হয় কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। তবে যাহাতে হাল্কা বাসাগুলি সামান্য বাতাসে বেশি নড়াচড়া না করে, তাহার জন্য বাবুইরা যে বাসায় খানিকটা করিয়া কাদা লাগাইয়া রাখে; ইহা আমরা দেখিয়াছি। জাহাজে যখন মাল বোঝাই থাকে না, তখন তাহা অল্প বাতাসে ও ঢেউয়ে ভয়ানক দুলিতে থাকে। তাই মাল্লারা জাহাজের খোলে বস্তা বস্তা বালি বোঝাই করিয়া রাখে। ইহাতে জাহাজ স্থির থাকে। বাসাগুলিকে স্থির রাখিবার জন্যই বাবুই-পাখীরা ঐ-রকমে বাসায় মাটি আট্‌কাইয়া রাখে। দেখ, বাবুই-পাখীরা কত হিসাবপত্র করিয়া বাসা তৈয়ারি করে।

বৎসরের কোন্ দিনে সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হইবে এবং কোন্ দিনই-বা গঙ্গাস্নানের যোগ আছে, এ-সব কথা আমাদের পাঁজিপুঁথিতে দিনক্ষণ ধরিয়া বেশ ভালো করিয়াই লেখা থাকে। কিন্তু কবে বৃষ্টি হইবে এবং কবেই-বা ঝড় হইবে ইহা আমাদের জ্যোতিষিগণ ও পণ্ডিতেরা গুণিয়া বলিতে পারেন না। তাই ঝড়বৃষ্টির খবর পাঁজিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক জন্তু-জানোয়ার, বৎসরে কি-রকম ঝড়বৃষ্টি হইবে তাহা আগে থাকিতেই জানিতে

পারে এবং তাহা জানিয়া সাবধানে বাসা তৈয়ারি করে। শুনিয়াছি বাবুইদের আবহাওয়ার জ্ঞান নাকি খুব বেশি। তাই বৎসরের অধিকাংশ সময়ে কোন্ মুখে বাতাস বহিবে তাহা আগে জানিয়া লইয়া, ইহারা বাসার মুখগুলিকে বাতাসের উল্টা দিকে রাখে। আমরা ইহা আজো পরীক্ষা করিতে পারি নাই; তোমরা যদি সুবিধা পাও তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো।

টুন্‌টুনি পাখী তোমরা হয়ত দেখিয়াছ। ইহাদের সম্বন্ধে আমরা ছেলেবেলায় যে কত গল্প শুনিয়াছি, তাহা বলিয়াই শেষ করা যায় না। তোমরাও বোধ হয় টুন্‌টুনির পায়ে কাঁটাফোটার ও নাপিতের বাড়ী কাঁটা বাহির করিতে যাওয়ার গল্পটা শুনিয়াছ। যাহাহউক টুন্‌টুনিরা যে বাসা বাঁধে তাহা বড় চমৎকার। দুই-এক হাত উঁচু ঝোপ-জঙ্গল বা বেড়ার উপরেই ইহাদের বাসা দেখা যায়। বাসা বাঁধিবার সময়ে ইহারা প্রথমে গাছের একটা পাতা বাছিয়া লইয়া, তাহার কিনারায় ঠোঁট দিয়া কতকগুলি ছিদ্র করে। তার পরে পাতার দুইপাশকে একত্র করিয়া এবং সূতা, গাছের আঁশ, পাট বা তূলা দিয়া বাঁধিয়া সেটিকে একটি ঠোঙার আকারে আনে। এই ঠোঙাই টুন্‌টুনিদের বাসা। ইহারা ঐ-সব জিনিস এবং কখনো মাকড়সার জাল দিয়া ঠোঙার

জোড়ের মুখ এমন সুন্দরভাবে সেলাই করিয়া রাখে যে, সে-বাঁধন কখনই খসিয়া যায় না। এই রকম বাসার ভিতরে তুলা পালক ইত্যাদি বিছাইয়া যে তিন-চারিটি ছোট ডিম পাড়ে সে-গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ডিমগুলিকে হঠাৎ দেখিলে সাদা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা নয়, সাদার উপরে লালের সুন্দর ছিঁটে-ফোঁটা থাকে।

ধনেশপাখী আমাদের বাংলাদেশের এধারে প্রায়ই দেখা যায় না। তাহারা থাকে বর্ম্মাদেশের জঙ্গলে আর চট্টগ্রামে। কথনো কথনো তুই একটা হঠাৎ কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া দেখা দেয়। ধনেশ প্রকাণ্ড ঠোঁটওয়ালা অতি বিশ্রী পাখী। ছোটো শরীরে অত বড় ঠোঁট দেখিলে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির কথা মনে পড়িয়া যায়। যাহাইউক এই পাখীদের বাসা বড় মজার জিনিস। ইহারা গাছের কোটরে নিজেদের গায়ের ছোটো পালক বিছাইয়া ডিম পাড়ে এবং যতদিন ডিম হইতে বাচ্চা বাহির না হয়, ততদিন স্ত্রী-পাখী কোটরের বাহিরে আসে না। কেবল ইহাই নয়, পাছে অন্য পাখী বা সাপ আসিয়া ডিম নষ্ট করে এই ভয়ে তাহারা বাসার মুখ নিজেদের বিষ্ঠা দিয়া বেশ ভালো করিয়া বন্ধ রাখে। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, ডিম হইতে বাচ্চা বাহির

না হওয়া পর্য্যন্ত পাখীরা বুঝি কিছু না খাইয়াই দিন কাটায়। কিন্তু তাহা নয়, বাসার দেওয়ালে তাহারা একটি ছোটো ছিদ্র রাখে। পুরুষ-পাখী বাহির হইতে ফল ও পোকামাকড় জোগাড় করিয়া সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাসার ভিতরে ঠোঁট্ চালাইয়া দেয় এবং স্ত্রী-পাখী ঠোঁট্ হইতে সেই সকল খাবার লইয়া খায়। ডিম ফুটিলে স্ত্রী-পাখী আর আবদ্ধ থাকিতে চায় না। তখন ঠোঁট্ দিয়া বাসার দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সে বাহিরে আসে এবং বাচ্ছাগুলিকে কোটরের ভিতরে রাখিয়া আবার তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। বাচ্চারা যখন বড় হয়, তখন তাহারা নিজেরাই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসে।

গাছের কোটরে বাসা করে এ-রকম পাখী আমাদের দেশে আরো অনেক আছে। কাঠঠোকরা পাখী তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহারা কখনই খড়কুটা দিয়া বাসা বাঁধে না; গাছের পোকা-খেকো গুঁড়ির পচা কাঠ ঠোঁট্ দিয়া কুরিয়া সুন্দর কোটর তৈয়ারি করে এবং তাহাতে ডিম পাড়ে। বাসা তৈয়ারি করিবার সময় কাঠঠোকরাদের কাঠকাটার ভঙ্গী বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। ইহারা প্রথমে নখ দিয়া পা দু'খানিকে গাছের ছালে বেশ করিয়া আটকাইয়া রাখে। তার পরে লেজটাকে খুব নীচু করিয়া

গাছের গায়ে লাগাইয়া দেয়। এইরকমে তাহাদের গাছ হইতে পিছ্‌লাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। তার পরে সেই ধারালো ঠোঁট দিয়া তাহারা কাঠ খুঁড়িতে সুরু করে। কোটরবাসী অন্য পাখীরা প্রায়ই বাসার ভিতরে খড়কুটা বা পালক বিছাইয়া ডিম পাড়ে। কিন্তু কাঠ্‌ঠোকরাদিগকে সে-রকমে ডিম পাড়িতে দেখা যায় না। ইহারা খালি কোটরের ভিতরে ডিম পাড়িয়া তায়ে বসিয়া যায়।

প্যাঁচা বড় মজার পাখী। ইহারা দিনের বেলায় লুকাইয়া ঘুমায় এবং সন্ধ্যার সময়ে বাহির হইয়া সমস্ত রাত্রি মাঠে-ঘাটে পোকা-মাকড় ইঁদুর-ছুঁচো শিকার করে। যখন উড়িয়া বেড়ায় তখন ইহাদের ডানায় একটুও শব্দ হয় না। ডিম পাড়িবার সময়ে প্যাঁচাদেরও বাসার দরকার হয়। হুতুম-প্যাঁচারা প্রায়ই গাছের কোটরে ডিম পাড়ে। আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় একবার দুইটা প্যাঁচাকে বাসা করিতে দেখিয়াছিলাম। এই-গুলিকেই 'কোটরে-প্যাঁচা' বলে। বাড়ীর বেশ নির্জ্জন জায়গায় কার্ণিসের উপরে ইহারা বাসা করে। পালকে ছিটেফোঁটা-লাগানো যে-সকল ছোটো প্যাঁচাকে আমরা 'কাল-প্যাঁচা' বলি সেগুলি প্রায়ই জঙ্গলে গাছের উপরে বাসা করে। তোমরা 'কাল-প্যাঁচা' দেখিয়াছ কি? রাত্রিতে

যখন চারিদিক্ নিস্তব্ধ তখন বাড়ীর কাছের কোনো গাছে বসিয়া ইহাদিগকে দশ-বারো সেকেণ্ড অন্তর "কক্" "কক্" শব্দ করিতে শুনা যায়। রাত্রিতে এই শব্দটা ভারি খারাপ শুনায়। ইহা কান্-উঁচু একজাত প্যাঁচার শব্দ। এই প্যাঁচারা গাছের ডালে খড়কুটা দিয়া বাসা তৈয়ারি করে এবং তাহাতে ডিম পাড়ে।

জলচর পাখীর বাসা

আমরা একে একে ডাঙার অনেক পাখীর বাসার কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এখন যে-সব পাখী জলে বা জলের ধারে চরিয়া বেড়ায় তাহাদের বাসার কথা বলিব। ডাহুক পাখী তোমরা হয়ত কেহ কেহ দেখিয়াছ। গ্রামের বাহিরে পুকুর বা বিলের ধারের ঝোপে ইহারা বাস করে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে তাহাদের চীৎকারে যেন কান ঝালাপালা করে। জলের পোকা-মাকড়ই ইহাদের প্রধান খাদ্য, তাই জলের ধার ছাড়া অন্য জায়গায় ইহাদের দেখা যায় না। ডাহুকেরা জলের ধারের ঝোপে বা বাঁশঝাড়ের উপরে বাসা বাঁধে। ইহাদের ডিমগুলি কালচে ধরণের,—তাহারি উপরে আবার খয়েরি এবং লাল রঙের ছিটেফোঁটা থাকে। ডাহুকেরা বর্ষার শেষে ডিম পাড়ে।

তোমরা বোধ হয় জানো, শীতকালে খালবিল ও নদীতে আমরা যে-সব বুনো হাঁস দেখিতে পাই তাহারা বারো মাসই আমাদের দেশে থাকে না। গ্রীষ্ম পড়িলেই

এদেশ ছাড়িয়া ঠাণ্ডাদেশে চলিয়া যায় এবং তার পরে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যখন জলাশয়ের জল কমিতে আরম্ভ করে তখন এদেশে নামিয়া মাছ ও পোকা-মাকড় খাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু বারো মাসই এদেশে বাস করে এমনও কয়েকটি জলচর পাখী আছে। সরাল তোমরা দেখিয়াছ কি? বর্ষার শেষ হইয়া আসিলে ইহারা জলের ধারে গাছের কোটরে বাসা করিয়া তাহাতে আট দশটা ডিম পাড়ে। কখন কখন আবার খালবিলের কাছে জলা মাটিতেও ইহাদিগকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়।

ডুবুরি পাখী আমাদের দেশে অনেক পুকুরে বারো মাসই থাকে। কৃষ্ণনগরের কুমারেরা যে-সব ছোটো ছোটো মাটির হাঁস তৈয়ারি করে, এগুলিকে ঠিক সেই-রকম খেলনা হাঁসের মত দেখায়। টুপ্-টাপ্ করিয়া ক্রমাগত জলে ডুব দিয়া ইহারা পাঁকের মধ্য হইতে ছোটো মাছ ও পোকামাকড় ধরিয়া খায়। প্রায় সব পাখীরই লেজ আছে কিন্তু ডুবুরিদের লেজ নাই। তোমরা এই ছোট হাঁস দেখ নাই কি? জলে যে-সব লম্বা ঘাস ও অন্য গাছ জন্মায় ডুবুরিরা তাহারি ভিতরে বর্ষার শেষে বাসা বাঁধে। নৌকা যেমন জলে ভাসিয়া বেড়ায়, আমরা ঘাস ও লতাপাতার উপরে ডুবুরিদের বাসাগুলিকে সেই-

রকমে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। অন্য পাখীরা বাসায় বসিয়া দিবারাত্রি ডিমে তা' দেয় কিন্তু ডুবুরিরা প্রায়ই তাহা করে না। দিনে চরিতে বাহির হইবার আগে ভিজে শেওলা দিয়া ডিমগুলিকে ঢাকিয়া রাখে এবং রাত্রিতে বোধ হয় বাসায় বসিয়া ডিমে তা' দেয়। তাই মনে হয়, সূর্য্যের তাপেই ডিমগুলি ফুটিয়া যায়।

বালি-হাঁস আমাদের খাল-বিল ও পুকুরে প্রায়ই দেখা যায়। জলের ধারের গাছপালার কোটরে ইহারা খড়কুটা দিয়া বাসা বাঁধে। তার পরে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সেখানে চৌদ্দ-পনেরোটা করিয়া ডিম পাড়ে।

সারস পাখী বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায় না। ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় খাল-বিল ও নদীতে বাসা বাঁধে। সারসের বাসাগুলি যেন এক-একটা ভেলা। জলে যে-সব খড়কুটা ও শুকনা ডালপালা ভাসিয়া বেড়ায় সারসেরা তাহাই একত্র করিয়া এক-একটা ছোটো ভেলা করে এবং তাহারি উপরে দুইটা তিনটা করিয়া ডিম পাড়ে।

জলপিপি পাখীরা সমস্ত বৎসরই জলের ধারে থাকিয়া মাছ ও জলের পোকা-মাকড় খায়। যখন টোপাপানায় বা পদ্মের পাতায় খাল ও বিলের জল ঢাকিয়া থাকে, তখন জলপিপিরা ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া পাতার

উপর হাঁটিয়া বেড়ায়। আমরা গ্রামের বাহিরের পুষ্করিণীতে এই-রকম জলপিপি অনেক দেখিয়াছি। তোমরাও হয়ত দেখিয়াছ। যাহা হউক, এই পাখীরাও জলের কাটা-কুটা ও লতাপাতা একত্র করিয়া তাহার উপরে ডিম পাড়ে। কিন্তু সারসেরা যেমন উঁচু ভেলার মতো বাসা বানায়, ইহারা তাহা করে না। জল-পিপিদের বাসার একটুখানিমাত্র জলের উপরে জাগিয়া থাকে এবং তাহারি উপরে উহারা ডিম পাড়ে। তাই দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন ডিমগুলি জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কয়েকটি অদ্ভুত বাসা

তোমরা তালচোঁচ পাখী দেখিয়াছ কি? ঘরের কড়ি-বর্গার ফাঁকে ইহারা বাসা করে এবং সন্ধ্যার আগে ঝাঁকে ঝাঁকে বাসা হইতে বাহির হয়। ইহারা উড়ন্ত পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়, তাই সমস্ত সকাল বিকাল উড়িয়া পোকা-মাকড় ধরিয়াই কাটাইয়া দেয়।

তাল-চোঁচেরা পালক ও মুখের লালা দিয়া বেশ জমাট রকমের বাসা তৈয়ারি করে। এই রকম বাসা আর কোনো পাখীর দেখা যায় না। বর্ণিয়ো দ্বীপে এক রকম তালচোঁচ আছে তাহারা কেবল মুখের লালা দিয়াই বাসা তৈয়ারি করে। জাপানী ও চীনারা এই বাসা সিদ্ধ করিয়া এক রকম ঝোল তৈয়ারি করে এবং তাহা খায়। জাহাজ বোঝাই হইয়া এই উপাদেয় খাদ্য চীনে ও জাপানে আমদানি হয়।

পাখীদের দেশ-ভ্রমণ

কাক, বক, ঘুঘু, প্যাঁচা, বুলবুল, শালিক, ছাতারে, ফিঙে প্রভৃতি পাখীরা বারো মাসই আমাদের দেশে বাস করে। কিন্তু এ-রকম পাখীও অনেক আছে যাহারা সারা বৎসর আমাদের দেশে থাকে না। তোমরা ইহাদের লক্ষ্য কর নাই কি? হাঁস কাদাখোঁচা গুড়গুড়ে চকাচকি চাহা বটের ধোবিন্ ইত্যাদি অনেক পাখী প্রতি বৎসর কয়েক মাসের জন্য আমাদের দেশে বাস
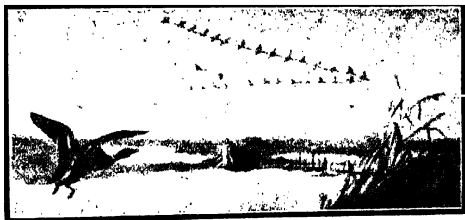
পাখীদের বিদেশ-যাত্রা।

করে। অগ্রহায়ণ মাসে যে-সব বুনো হাঁস ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া খাল বিল ও নদীতে চরিয়া বেড়ায় তাহারাও বারো মাস বাংলা দেশে থাকে না; সমস্ত শীতকালটা

এদেশে থাকিয়া একটু গরম পড়িলেই তাহারা যে ঠাণ্ডা দেশ হইতে আসিয়াছিল সেখানে উড়িয়া যায়। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, এই সব পাখী সিমলা দার্জ্জিলিং বা শিলং পাহাড়ের জঙ্গলে বেড়াইতে যায়। কিন্তু তাহা নয়, ইহাদের মধ্যে কেহ সাইবেরিয়া, কেহ তিব্বত, কেহ-বা হিমালয়ের উঁচু জায়গায় চলিয়া যায় এবং সেখানে ডিম পাড়িয়া ও বাচ্চাদের পালন করিয়া গ্রীষ্মকালটা কাটাইয়া দেয়। তার পরে যেই বেশী শীত পড়ে অমনি তাহারা উত্তর ভারতে আসিয়া দেখা দেয়। পাখীদের এইরূপ দেশ-ভ্রমণ মজার ব্যাপার নয় কি ? ইহাদের কেহ কেহ সাত-আট হাজার মাইল দূর হইতে আসে এবং মাটি হইতে চারি-পাঁচ মাইল উপর দিয়া চলে অথচ রাস্তা ভুলে না। আমাদের দেশে ভ্রমণকারী পাখীর সংখ্যা কম। য়ুরোপের নানা দেশে যখন এই রকম পাখীরা যাওয়া আসা করে, তখন পাখীতে পাখীতে আকাশ ঢাকিয়া যায়। দিনরাত্রি তাহারা উড়িয়া চলে। সমুদ্রের উপর দিয়া সোজাপথে আসিবার সময়ে হয়ত ঝড়-বৃষ্টিতে পড়িয়া মারা যায়, কতক আবার জাহাজের আলো দেখিয়া সেখানে মাথা ঠুকিয়া মরে। কিন্তু তথাপি তাহারা ভ্রমণে ক্ষান্ত হয় না। দেশ-বিদেশে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা

সমস্ত বৎসর ধরিয়াই পাখীদের আনাগোনা পরীক্ষা করেন। তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এক-এক রকম পাখী বৎসরের এক-একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে দেশে আসিয়া দেখা দেয়, এবং এক-একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে বিদেশ-যাত্রা করে। আমরা যেমন পাঁজিপুথি দেখিয়া যাত্রা করি, ইহাদের যাওয়া-আসা যেন সেই রকমের। কেবল ইহাই নয়, একদল হাঁস এ বৎসর যে পুষ্করিণীতে আসিয়া চরিয়া বেড়াইল, বৎসরের পর বৎসর তাহারা ঠিক্ সময়ে সেই পুষ্করিণীতে আসিতে ভুল করে না। পাখীদের পায়ে আংটি ও নাকে নথ লাগাইয়া চিহ্নিত করিয়া ইহা বার বার পরীক্ষা করা হইয়াছে। আশ্চর্য্য নয় কি? বড় বড় সহরে যাহাতে লোকের দিক্ ভুল না হয় তাহার জন্য বাড়ীর নম্বর ও রাস্তার নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে। সেগুলি দেখিয়া লোকে চলা-ফেরা করে। জাহাজগুলি যাহাতে ঠিক্ পথে চলিয়া ঠিক্ জায়গায় যাইতে পারে তাহার জন্য জাহাজে কত যন্ত্রপাতি ও ম্যাপ রাখা হয়। তবুও কখনো কখনো জাহাজ বিপথে গিয়া পাহাড়ে ঠেকে ও ডুবিয়া মারা যায়। ছোটো পাখীদের কাছে যন্ত্রপাতি থাকে না এবং দেশের ম্যাপও থাকে না, তবুও তাহারা কেমন করিয়া পাঁচ হাজার দশ হাজার মাইল পথ কখনো

ঝড়ের মধ্য দিয়া কখনো-বা রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়া চলিয়া ঠিক্ জায়গায় ঠিক্ দিনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বাস্তবিকই বুঝা যায় না।

যাহা হউক, এসম্বন্ধে অনেক লোকে অনেক পরীক্ষা করিয়া যাহা অনুমান করিয়াছেন, তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমরা চোখ দিয়া বাহিরের জিনিস-পত্র দেখ, নাক দিয়া গন্ধ শুঁকিয়া লও এবং কান দিয়া শব্দ শুন;—আর বোধ করি মনে মনে ভাব অন্য জন্তুরাও বুঝি এই রকমে দেখা-শুনা করে। কিন্তু তাহা নয়, আমাদের চোখের তেজের চেয়ে পাখী ও বিড়ালের চোখের তেজ বেশি, আমাদের গন্ধ শুঁকিবার শক্তির চেয়ে কুকুরের ঐ শক্তি অনেক বেশি। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? তা ছাড়া আমাদের আদপে যে সব শক্তি নাই, সে-রকম শক্তি অনেক জন্তু-জানোয়ারের দেখা যায়।

আমাদের বাড়ীতে একটা ভয়ানক দুষ্ট কুকুর ছিল। তার নাম ছিল কেষ্টা। রাত্রিতে সে অকাতরে নিদ্রা দিত এবং দিনের বেলায় দুধ ভাত যাহা পাইত চুরি করিয়া খাইত। আমরা ভয়ানক রাগিয়া একদিন তাহাকে রেলগাড়িতে চাপাইয়া দশ-বারো ক্রোশ দূরের এক ষ্টেশনে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। মনটা বড় খুসী হইয়াছিল,—ভাবা গেল আপদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া গেল।

কিন্তু হতভাগা কেষ্টা দু'দিন পরে আবার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। কেষ্টা রাস্তা চিনিত না, তবে কি-রকমে সে আবার আসিয়া জুটিল, তোমরা বলিতে পার কি?

এ-সম্বন্ধে অনেক লোকে বলেন, জন্তু-জানোয়ারের হয় ত রাস্তা চেনার একটা বিশেষ শক্তি আছে। চোখ কান নাকের মতো তাহাদের শরীরের ভিতরে উহার জন্য বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয় আছে কি-না জানা যায় নাই। কিন্তু এই-রকম না-জানা ব্যাপার অনেকই আছে। তাই অনেকে মনে করেন পথ-চেনা এবং দিক ঠিক করার জন্য ছোটো প্রাণীদের বিশেষ ইন্দ্রিয় থাকা অসম্ভব নয়। পাখীদের রাস্তা চিনিয়া দেশভ্রমণ সম্বন্ধে অনেকে সেই-কথাই বলেন।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। দেশে খাবার না পাইলে মানুষ কি করে তোমরা দেখ নাই কি? তখন তাহারা বিদেশের ভালো জায়গায় গিয়া আড্ডা করে এবং সেখানে চাষ-আবাদ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। পৃথিবীর যেখানে নিবিড় বন ছিল এই রকমে সেখানে বড় বড় নগর ও চাষ-আবাদের জায়গা হইয়াছে। তাই অনেকে মনে করেন, সাইবেরিয়া প্রভৃতি খুব ঠাণ্ডা দেশ শীতকালে যখন বরফে ঢাকা পড়িয়া যায়, তখন সেখানে

খাবার না পাইয়া পাখীরা পেটের জ্বালায় নিজের দেশ ছাড়িয়া দূরের গরম দেশে আসে এবং সেখানে পেট ভরিয়া খাবার খায়। তার পরে যখন সেই সব জায়গা গরম হইয়া পড়ে, তখন তাহারা আবার নিজেদের দেশে ফিরিয়া সেখানে ডিম পাড়ে ও সন্তান পালন করে। দেশে গিয়া ডিম-পাড়া ও সন্তান পালন করার ইচ্ছাটাও বড় কম তাগিদ নয়।

ভ্রমণকারী পাখী

যে-সব পাখী শীতের সময়ে আমাদের দেশে আসিয়া গ্রীষ্মকালে শীতের দেশে যায়, তাহাদিগের কতকগুলির নাম তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। এখানে তাহাদের একটু বিশেষ বিবরণ দিব।

জোয়ারি পাখী তোমরা বোধ করি সকলে দেখ নাই। ইহাদের মাথা, লেজ, ডানা ও গলা কুচ্‌কুচে কালো, কিন্তু শরীরটা গোলাবি রঙের পালকে ঢাকা। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইহারা দলে দলে শীতকালে আসে। তা'র পরে একটু গরম পড়িলেই ফাল্গুন মাসে তাহারা দল বাঁধিয়া স্বদেশে যাত্রা করে। ক্ষেত হইতে জোয়ারি খাইয়া নষ্ট করে বলিয়া ইহাদিগকে জোয়ারি-পাখী বলা হয়। ইহাদের আসল বাসস্থান এসিয়া-মাইনর। আমাদের দেশ হইতে ফিরিয়া সেখানে গিয়া ডিম পাড়ে ও সন্তান পালন করে। তা'র পরে শীত পড়িলেই তাহারা বাচ্চা-কাচ্চা সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আসে।

কল হাঁস বা কড় হাঁস আমাদের দেশে এক-এক সময়ে অনেক দেখা যায়। ইহাদের দেখিতে কতকটা

যেন ছোটো রাজহাঁসের মতো। কিন্তু গায়ের পালক সাদা নয় এবং ডানাও রাজহাঁসের মতো ছোটো নয়—মাথার-পালক যেন কতকটা খয়েরি এবং গায়ের রঙ্ ছেয়ে। এই হাঁসদের আসল বাড়ী তিব্বত ও সাইবেরিয়ার বরফের দেশে। শীতকালে বাংলাদেশে আসিয়া ইহারা ফাল্গুনেই আবার নিজের দেশে ফিরিয়া যায়। যখন সারি বাঁধিয়া উড়িতে উড়িতে যাওয়া-আসা করে, তখন ইহাদিগকে সুন্দর দেখায়। ইহারা প্রায়ই ত্রিভুজের আকারে সারি বাঁধিয়া চলে। দলের সর্দ্দার থাকে ত্রিভুজের ঠিক মাথায়। সর্দ্দার প্রায়ই বুড়ো লোক হয়,—কারণ বুড়োদেরই লোকে মানে ও ভয় করে। কিন্তু পাখীদের মধ্যে এই নিয়মটা খাটে না। অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন, পাখীদের ছানারাই নাকি সকলের আগে চলিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। পাখীরা বুড়োদের বাদ দিয়া কেন ছেলে-ছোক্‌রা দিয়া এই কাজ চালায় তাহা পাখীরাই জানে। বোধ করি ইহার ভিতরে একটা কোনো রহস্য আছে।

শীতকালে আমাদের দেশের খাল-বিলে চকা-চকি পাখী প্রায়ই দেখা যায়। ইহারা জোড়া জোড়া থাকিয়া জলে খাবারের সন্ধান করে। এই পাখীরাও আমাদের দেশে বারো মাস থাকে না। শীতকালে আসিয়া ইহারা

চৈত্র মাসেই দল বাঁধিয়া বাংলা দেশ ত্যাগ করে। যাহারা জোড়া জোড়া চরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকেও যাওয়া-আসার সময়ে দল বাঁধিতে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দূরে তীর্থ করিতে যাইবার সময়ে যেমন নানা দেশের লোকে দল পাকাইয়া আনন্দে যাত্রা করে, ইহারা যেন সেই-রকম দলবদ্ধ হইয়া আনন্দে যাত্রা সুরু করে।

লটোরা পাখী তোমরা দেখিয়াছ কি-না জানি না। আমাদের দেশে ইহাকে কেহ কেহ কচকচে লটোরাও বলে। লটোরারা বাস করে, তিব্বত মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়া দেশে। শীতের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলেই ইহারা আমাদের দেশে আসে।

কার্ত্তিক মাসে একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই খঞ্জন-জাতির দুই তিন রকম ছোটো পাখী আমাদের দেশে চরিতে আসে। তোমরা বোধ করি ইহাদের দেখিয়াছ। বাংলায় ইহাদের নাম কি জানি না; হিন্দিতে ইহাদের বলা হয় ধোবিন্। পাখীগুলি চড়াইয়ের চেয়ে একটু বড়। মুখ, গাল, গলা সাদা। কিন্তু বুকের খানিকটা, মাথার পিছন দিক্ এবং ঘাড় কালো। ডানার পালকের রঙ্ সাদা ও কালো। লেজটা কিন্তু খুব লম্বা এবং লেজের মাঝের পালকটাই কালো। এখন বোধ করি তোমরা এই পাখীদের চিনিতে পারিয়াছ।

কাক, শালিক প্রভৃতি পাখীরা যেমন লেজ স্থির রাখিয়া চরিয়া বেড়ায়, ইহারা প্রায়ই তাহা করে না। ইহাদের লেজগুলিকে প্রায়ই তিড়িক্ তিড়িক্ করিয়া নাচিতে দেখা যায়। উড়িবার সময় আবার নানা ভঙ্গিতে ঢেউয়ের আকারে উড়িয়া বেড়ায় এবং সঙ্গে বেশ সুমিষ্ট কিচ্ কিচ্ শব্দ করে। যাহা হউক, এই পাখীদের আসল বাড়ী উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে। একটু শীত পড়িলেই দলে দলে উড়িয়া আমাদের দেশে আসে। ইহাদের আসা দেখিলেই শীত আসিতেছে বলিয়া লোকে বুঝিতে পারে।

সা-বুল্‌বুল্ তোমরা হয়ত সকলে দেখ নাই। বাংলা দেশে মাঝে মাঝে ইহাদের দেখা যায়। ইহারা বড় সুন্দর পাখী। লেজের দুইটা পালক শরীরের চেয়েও লম্বা। গায়ের রঙ্‌ও বড় সুন্দর। সা-বুল্‌বুলেরা শীতকালটা কাটায় দক্ষিণ-ভারতে। তা'র পরে চৈত্র মাস পড়িলেই বাংলা দেশে দেখা দেয়। এখানে ডিম পাড়িয়া বাচ্চা বড় হইলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাহারা আবার দক্ষিণ-ভারতে চলিয়া যায়।

হল্‌দে পাখীদের ভ্রমণের কথা বড় মজার। ইহারা আমাদের বাংলা দেশেই বারো মাস কাটায় এবং এখানেই বাসা বাঁধে এবং বাচ্চা প্রতিপালন করে। কিন্তু হল্‌দে পাখীদের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শীতকালে প্রায়ই দেখা

যায় না। তখন বোধ করি, তাহারা আমাদের দেশে চলিয়া আসে। ইহা দেখিয়া মনে হয় হল্‌দে পাখীরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শীতের শুক্‌না হাওয়া সহ্য করিতে পারে না।

বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত কোকিলের কু কু শব্দ শুনা যায় না বলিয়া লোকে বলে বর্ষা পড়িলেই কোকিলেরা বাংলা মুলুক ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু একথাটা ঠিক্ নয়। ইহারা বাংলা দেশ ছাড়িয়া কোথাও যায় না। বর্ষাকাল পড়িলেই ইহাদের গলা খারাপ হইয়া যায়। তখন আর তাহারা আগেকার মতো গলা ছাড়িয়া টানাস্বরে ডাকিতে পারে না। তাই লোকে বলে কোকিল বর্ষা পড়িলেই দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু কোকিল ও পাপিয়ারা আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব দেশ হইতে পালাইয়া যায়।

শীতের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে উত্তর দেশ হইতে যে কত ছোটো পাখী বাংলা দেশে আসে তাহা গুণিয়াই শেষ করা যায় না এবং তাহাদের সকলের নামও আমরা জানি না। বোধ করি এই সকল পাখী তিন চারি মাসের জন্য আমাদের দেশে বেড়াইতে আসে বলিয়ালোকে তাহাদের খোঁজ রাখে না। গোলাবি রঙের তুতি, খয়েরি রঙেরথর্ থরে,—ইহারা ছোটো পাখী।

কিন্তু শীত পড়িলেই ইহারা বহু দূরের ঠাণ্ডা দেশ হইতে বাংলা মুলুকে ছুটিয়া আসে।

চাহা ও বটের পাখী আমাদের শিকারীদের বন্দুকের গুলিতে হাজারে হাজারে মারা পড়ে। কিন্তু তথাপি শীতের বাতাস গায়ে ঠেকিলে তাহারা আর নিজেদের দেশে থাকিতে চায় না,—তখন দিনরাত্রি উড়িয়া দলে দলে বাংলা দেশে আসিয়া পড়ে। বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট, খাল-বিল শীতকালে নানা শস্যে ও নানা রকম মাছে ভরা থাকে, তাই পেট ভরিয়া দুই মাস খাইবার জন্য ইহারা মৃত্যুকেও ভয় করে না।

শীতকালে তোমরা যদি গ্রামের বাহিরে খালের ধারে বেড়াইতে যাও, তাহা হইলে তোমরা পানকৌড়ি বক শাঁকনল মদনটিকি মাণিকজোড় মাছরাঙা রাম-শালিক সড়াল বালিহাঁস প্রভৃতি যে কত পাখী দেখিতে পাইবে, তাহা হয় ত গুণিয়াই শেষ হইবে না। ইহাদের মধ্যেও অনেকে শীত কাটাইবার জন্য ভারতবর্ষে আসে। কত রকম রকম হাঁস যে হিমালয় পার হইয়া শীতকালে আমাদের দেশে আসে, আমরা তাহাদের সকলের নামও জানি না।

পাখীদের বেশভূষা ও নাচ-গান

জগদীশ্বর যত রকম প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পাখীরাই বোধ করি সকলের চেয়ে সুন্দর। শকুন হাড়গিলা প্রভৃতি বিশ্রী পাখী অনেক আছে জানি, কিন্তু অধিকাংশ পাখীই সুশ্রী। তোমরা যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে, ভাল কাপড়চোপড় গয়না প্রভৃতির উপরে ঝোঁক্ থাকে মেয়েদের। তোমাদের দু'তিন বছরের ছোটো বোনটিকে লক্ষ্য করিয়ো, একখানা লাল্ টুক্‌টুকে সাড়ি বা দু'গাছা সুন্দর বালা পাইলে সে যত খুসী হইবে, অন্য কিছুতেই তাহাকে সে-রকম খুসী দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তোমার ছোটো ভাইটি লাল জামার লোভে ভুলিবে না,—সে চাহিবে ভাল খেলনা, রবারের বল্; তাহাকে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য ভালো কাপড়-চোপড় পরানোই কঠিন হয়। মেয়েদের বেশভূষার দিকে দৃষ্টি কেবল ছোটো বেলায় নয়, বয়স হইলেও দেখা যায়। কিন্তু পাখীদের মধ্যে দেখা যায় তাহার উল্‌টা,—স্ত্রী-পাখীর তুলনায় অনেক

পুরুষ-পাখীরই গায়ের পালকের রঙ্ সুন্দর, তা'ছাড়া বোধ করি পুরুষ পাখীরাই স্ত্রীদের চেয়ে বেশি সিম্‌সাম্ থাকিতে চায়। ইহা তোমরা লক্ষ্য কর নাই কি? তোমাদের বাড়ীর বারান্দায় যে চড়াই পাখীরা সমস্ত দিন কিচির মিচির করে, তাহাদিগকে ভালো করিয়া দেখিলে দেখিবে পুরুষ-চড়াইদের মাথার খানিকটা এবং পিছনটা ছাই রঙের; গলার রঙ্ কালো, কিন্তু ঘাড়ের দুই ধার সাদা। সব মিলিয়া পুরুষ-চড়াইদের মন্দ দেখায় না। কিন্তু স্ত্রী-চড়াইদের চেহারা বিশ্রী। কেবল চড়াই নয়, কোকিল, মুনিয়া, বাবুই, শ্যামা খঞ্জন, টুন্‌টুনি, মুরগী, সা-বুল্‌বুল্, ময়ূর প্রভৃতি অনেক পাখীর মধ্যেই তোমরা স্ত্রীর তুলনায় পুরুষদের গায়ে উজ্জ্বল পালক দেখিতে পাইবে।

কেন স্ত্রী ও পুরুষ পাখীদের পালকের রঙ্ ভিন্ন হয়, এ-সম্বন্ধে অনেক লোকে অনেক কিছু বলিয়াছেন। সে-সব কথা তোমাদিগকে বলিব না। মোটামুটি ব্যাপার এই যে, পুরুষের তুলনায় পাখীদের মধ্যে স্ত্রীরই সংখ্যা বেশি। তাই বাসা বাঁধিবার ও ডিম পাড়িবার সময় আসিলে স্ত্রী-পাখীদের লইয়া পুরুষদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি লাগিয়া যায়। তাই কয়েক জাতি পাখী পুরুষেরা সাজসজ্জা ভালো করিয়া স্ত্রীদের মন ভুলাইয়া সঙ্গিনী

করে। কেবল ইহাই নয়—গান করিয়া নাচিয়াও অনেক পুরুষ-পাখী স্ত্রীদের মন ভুলায়। যখন ডিম পাড়ার সময় আসে, তখন পুরুষ-কোকিলেরা কেমন সুন্দর স্বরে গান করে, তাহা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। এই সুন্দর স্বরে কোকিলেরা বারো মাস ডাকিতে পারে না। তাই দেখিয়া অনেকে বলেন, কোকিলের এই সুস্বর স্ত্রীদের মন ভুলাইবার ফন্দি। অঙ্গভঙ্গী ও নাচ দ্বারা যে-সব পাখী স্ত্রীদের মন ভুলাইতে চায় সে-রকম পাখীও আমাদের দেশে আছে। পায়রা বুল্‌বুল্ ছাতার প্রভৃতি পাখীতে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। পুরুষ-পায়রা যখন স্ত্রী-পায়রার চারিদিকে অঙ্গভঙ্গী করিয়া "বক্-বকম্" করিয়া ডাকিতে থাকে তখন বড় সুন্দর দেখায়। তোমাদের যদি পোষা ময়ূর থাকে তবে দেখিতে পাইবে, ময়ূরীর কাছে যখন ময়ূরগুলা পেখম তুলিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন তাহাতে নাচেরই ভঙ্গী দেখা যায়। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে স্ত্রী-পাখীর মন ভুলাইবার জন্য আমাদের দেশের নানা জাতি পাখীকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে দেখিবে।

পাখীদের বংশ-পরিচয়

তোমরা বোধ করি মনে কর, মানুষ, বানর, গরু কুমীর, মাছ প্রভৃতি জন্তুদের পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। আজকাল বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেন,—অনেক বৎসর আগে পৃথিবীতে হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া একটা ছোটো জীবের জন্ম হইয়াছিল। সে-জীবের ছিল কেবল প্রাণটুকু,—তাহার হাত-পা ছিল না, নাক-চোখ-কান ছিল না, পেট-মাথা-মুখও ছিল না। সে ইট্-পাথর-মাটির মতো জড়বৎ পড়িয়া থাকিত,—গায়ে যদি কোনো খাবার ঠেকিত তবে তাহাই চুষিয়া খাইত। তাহাদের বাচ্চা হইত না,—নিজেদের দেহকেই ভাগ করিয়া তাহারা একটা হইতে দুইটা, দুইটা হইতে চারিটা জীব হইয়া দাঁড়াইত। বহুকাল, হয় ত অনেক হাজার বৎসর ধরিয়া এই রকমই চলিয়াছিল। তা'র পরে সেই বিন্দু-প্রমাণ জীবের শরীরে যখন ক্রমে পাকযন্ত্র, চোখ কান নাক এবং আরো কত যন্ত্রাদি আসিয়া দেখা দিল, তখন

তাহারাই হইল প্রাণী। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এই-রকমে এক জাতি প্রাণীরই বুঝি সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তাহা নয়, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় শরীরে দেখা দেওয়ায় ভিন্ন প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। তা'র পরে সেই-সব মূল প্রাণী আরো উন্নতি লাভ করিয়া, আজকালকার নানা প্রাণীর আকার পাইয়াছে এবং যাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা অধম প্রাণীর আকারে আজো রহিয়া গিয়াছে। কি-রকমে জড়বৎ প্রথম জীবের শরীরে নানা অঙ্গের সৃষ্টি হইল, তাহার কথা তোমাদিগকে এখন বলিব না। ইহার পরিচয় দিতে গেলে অনেক কথা বলা প্রয়োজন। তোমরা বড় হইয়া যখন প্রাণিতত্ত্বের বড় বড় কেতাব পড়িবে তখন তাহা জানিতে পারিবে।

যাহা হউক, আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, টিক্‌টিকি ও গিরগিটিরাই পাখীদের আদিপুরুষ। ঐ প্রাণীরাই নানা অবস্থায় পড়িয়া শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদ্‌লাইয়া পাখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমরা বোধ হয়, ইহা বিশ্বাস করিতেছ না। কিন্তু এ-সম্বন্ধে যে-সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অবিশ্বাসের কিছুই নাই। মনে কর, টিক্‌টিকি গিরগিটি প্রভৃতি সরীসৃপের লেজে ও সর্ব্বাঙ্গে পালক গজাইল এবং সম্মুখের দু'খানা পা

ডানা হইয়া দাঁড়াইল। এই অবস্থায় গিরগিটির চেহারা কি-রকম হয় মনে করিয়া দেখ দেখি—পাখীর মতো হয় না কি? বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক এই কথাই বলেন। অতি প্রাচীন-কালের সরীসৃপেরা পাখীদের মতোই দু'খানা পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিত এবং কয়েকজাতি গিরগিটি সম্মুখের পা দু'খানি দিয়া পাখীর মতো উড়িতেও পারিত। এখন সে-সব জানোয়ার আর পৃথিবীতে নাই। মাটির তলায় তাহাদের কঙ্কাল পাওয়া যায়। তোমরা হয়ত বলিবে সরীসৃপের মুখে দাঁত আছে, কিন্তু পাখীদের ঠোঁটে দাঁত নাই। লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে যখন সরীসৃপেরা সত্য পাখীর আকার পাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহাদের ঠোঁটে সত্যই দাঁত ছিল। এই রকম প্রাচীন পাখীর কঙ্কালও মাটির তলায় পাওয়া গিয়াছে। তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, পাখীরা সেই দাঁত, হারাইল কি-রকমে? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, পাখীদের খাবার চিবাইবার প্রয়োজন হয় না বলিয়াই তাহাদের দাঁত ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গিয়াছে। বুনো হাঁস হাজার হাজার মাইল অনায়াসে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। কিন্তু আমাদের পোষা পাতিহাঁসেরা দশ হাতও ভালো করিয়া উড়িতে পারে না, তাই দিনে দুপুরেও

তাহাদের শিয়ালে ধরিয়া খায়। পাতিহাঁসের উড়িবার শক্তি কেমন করিয়া লোপ পাইল তোমরা অনুমান করিতে পার নাকি? বহু যুগ ধরিয়া তাহাদের উড়িবার দরকার হয় নাই, তাই তাহাদের ডানার জোর কমিয়া গিয়াছে। উট্ পাখীরাও এই রকমে দৌড়াইবার শক্তি বাড়াইয়া উড়িবার শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং দীর্ঘ কালের অপ্রয়োজনে যে পাখীরা ক্রমে দাঁত হারাইয়া বসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

সমাপ্ত